গবেষণাপত্র সংকলন-৫

ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ): শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব (রহ): জীবন ও কর্ম

অধ্যক্ষ এ.কিউ.এম. আবদুল হাকীম আল মাদানী
ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

গবেষণাপত্র সংকলন-৫

ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ) ঃ জীবন ও কর্ম

অধ্যক্ষ এ.কিউ.এম. আবদুল হাকীম আল মাদানী

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব (রহ) ঃ জীবন ও কর্ম

ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশকের কথা

ইসলামের নিখাদ জ্ঞানের বিস্তার ঘটিয়ে চিন্তার বিশুদ্ধি সাধন, উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ গড়ন এবং পরিশীলিত সমাজ বিনির্মাণে যাঁরা বড়ো রকমের অবদান রেখে গেছেন ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ) ও শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব (রহ) তাঁদের কাতারে শামিল।
সমাজ থেকে জাহিলিয়াতের বিতাড়ন প্রয়াসে তাঁদের ভূমিকা ছিলো যেমনি সত্যাশ্রয়ী, তেমনি আপোসহীন।

আল কুরআন ও আস্ সুন্নাহর উজ্জীবনে তাঁরা অসাধারণ ভূমিকা পালন করে গেছেন। তাঁদেরকে বিভিন্ন ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু কোন বাধাই তাঁদেরকে কক্ষচ্যুত করতে পারেনি।

আমাদের দেশে এই দুই ব্যক্তির জীবন ও কর্ম সম্পর্কে অবগতি খুবই সীমিত। অধ্যক্ষ এ.কিউ.এম. আবদুল হাকীম আলমাদানী রচিত "ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ) ঃ জীবন ও কর্ম" এবং ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ রচিত "শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব (রহ) ঃ জীবন ও কর্ম" শীর্ষক গবেষণা পত্র দুইটিতে তাঁদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যের সমাহার ঘটেছে। গবেষণাপত্র দুইটি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের গবেষণা বিভাগ থেকে "গবেষণাপত্র সংকলন-৫" নামে প্রকাশিত হচ্ছে। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আঞ্জাম দিতে পেরে আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি।

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ) ঃ
জীবন ও কর্ম

অধ্যক্ষ এ.কিউ.এম. আবদুল হাকীম আল মাদানী

অধ্যক্ষ এ.কিউ.এম. আবদুল হাকীম আলমাদানী কর্তৃক প্রণীত "ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ) ঃ জীবন ও কর্ম" শীর্ষক গবেষণাপত্রটির কপি প্রথমে চব্বিশজন ইসলামী চিন্তাবিদের নিকট পাঠানো হয়। অতপর মে ২২, ২০০৮ তারিখে গবেষণাপত্রটি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত "স্টাডি সেশনে" উপস্থাপিত হয়।

উক্ত "স্টাডি সেশনে" গবেষণাপত্রটির মানোন্নয়নে অংগুলি নির্দেশ করে বক্তব্য রাখেন– ড. মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, অধ্যাপক এ.এন.এম. রাফিকুর রাহমান, ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান, ড. মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান, ড. আ.জ.ম. কুতবুল ইসলাম নু'মানী, ড. নজরুল ইসলাম খান আলমা'রূফ, মাওলানা মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন, জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক ও জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইবনু তাইমিয়ার (রহ) ঃ জীবন ও কর্ম

ভূমিকা

মুসলিম বিশ্বের যে কয়জন মহান ব্যক্তিত্ব ইসলামের সঠিক রূপ সংরক্ষণে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন এবং শিরক, বিদআত, কুফর ও অনাচার থেকে ইসলামকে মুক্ত ও নির্ভেজাল করার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের মধ্যে আল্লামা ইবনু তাইমিয়া (রহ) বিশেষ ঈর্ষণীয় স্থান দখল করে আছেন। তিনি ছিলেন একাধারে অপ্রতিদ্বন্দ্বি মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ, বাগ্মি, আকায়েদ শাস্ত্রের সুপণ্ডিত, শিরক, বিদআত ও অনাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী এবং আল্লাহর নির্ভীক সৈনিক। তাঁর জ্ঞান গরিমার ব্যাপকতার ব্যাপারে পক্ষ ও বিপক্ষ সবাই একমত ছিল। নিম্নে তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো।

নাম ও বংশ পরিচয়

নাম : আহমাদ, উপাধি শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দীন, কুনিয়াত আবুল আব্বাস। তাঁর বংশ পরিচয় নিম্নরূপ :

শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু শিহাবুদ্দীন আবদুল হালীম ইবনু মাযদুদ্দীন আবদুস সালাম ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল খাদির ইবনু আলী ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু তাইমিয়া আল হাররানী আল হাম্বলী। তিনি ছিলেন একজন মহান ধর্ম শাস্ত্রবিদ ও ফকীহ। তাঁর বংশে সাত আট পুরুষ পর্যন্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলে আসছিল। সকলেই জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন মহান সাধক।[১]

জন্ম ও মৃত্যু

আল্লামা ইবনু তাইমিয়া (রহ) ৬৬১ হিজরী ১০ই রবিউল আউয়াল সোমবার, মুতাবিক ১২৬৩ সালের ২৩ শে জানুয়ারী তারিখে সিরিয়ার রাজধানী দামিশক শহরের নিকটবর্তী হাররান নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৭২৮ হিজরী ২০

১. ই.বি. কোষ-১/১২৭ (ইবনু তাইমিয়া) আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-১৪/১৩৫, ভূমিকা নাইনুল আওতার, পৃ. ৫

শে যুলকাদাহ্ রোববার দিবাগত রাতে, মুতাবিক ১৩২৮ সালের ২৭ শে সেপ্টেম্বর মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।[২]

"ইবনু তাইমিয়া" নামকরণ

বর্ণিত আছে যে এই মনীষীর প্রপিতামহ তাঁর গর্ভবতী স্ত্রীকে রেখে হজ্জ করতে যান। হজ্জ সমাপ্ত করে বাড়িতে ফেরার সময় তিনি "তাইম" নামক স্থানে একটি ফুটফুটে সুন্দরী শিশু কন্যাকে দেখতে পান। বাড়ি ফেরার পর তাঁর নবজাতক শিশু কন্যাটিকে দেখেই তাকে يا تيمية (ইয়া তাইমিয়াহ) বলে সম্বোধন করেন। কেননা শিশুটি তাঁর চোখে 'তাইমা'র সেই শিশুটির অবয়বে দেখা দিয়েছিল। কালে তাঁর এই শিশু কন্যাটি সুশিক্ষিত ও বহু গুণসম্পন্না হয়ে উঠে এবং চতুর্দিকে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। এই কারণে এই বংশের পুরুষ সদস্যগণ এই মহিলার নামের সাথে তাঁদের নাম সংযুক্ত করেন এবং ইবনু তাইমিয়া বলে নিজেদের পরিচয় দেন।[৩]

ইবনু তাইমিয়ার (রহ) পূর্ব পুরুষদের পরিচয়

ইবনু তাইমিয়ার (রহ) সমগ্র পরিবারটি একটি সুবিখ্যাত আলিম পরিবার হিসেবে পরিচিত ছিল। তাঁর ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিত্ব "তাইমিয়া" অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। বাগ্মিতায় তাঁর অসাধারণ খ্যাতি কিছু দিনের মধ্যে পরিবারটিকে তাইমিয়া পরিবার নামে সর্বত্র পরিচিত করে তোলে।[৪]

শাইখুল ইসলাম তাকীউদ্দীন আহমাদ ইবনু তাইমিয়ার দাদা আল্লামা আবুল বারাকাত মাজদুদ্দীন আবদুস সালাম হাম্বলী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ আলিমদের মধ্যে গণ্য হতেন। কেউ কেউ তাঁকে মুজতাহিদ হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। হাদীসের রিজাল শাস্ত্রে পারদর্শী ইমাম হাফিয আয যাহাবী (রহ) তাঁর "সিয়ারু আলাম আন নুবালা" গ্রন্থে লিখেছেন : মাজদুদ্দীন ইবনু তাইমিয়া ৫৯০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে নিজের চাচা বিখ্যাত খতীব ও বাগ্মী ফখরুদ্দীন ইবনু তাইমিয়ার কাছে শিক্ষা লাভ করেন। অত:পর হাররান ও বাগদাদের আলিম ও মুহাদ্দিসদের কাছে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। ফিকহে তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেন। এক্ষেত্রে তিনি ইমামের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন বলা যায়। তাঁর

২. ই.বি. কোষ-১/১২৭ (ইবনু তাইমিয়া) আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-১৩/২৪১, তাজকিরাহ-৪/১৪৯৬ ও ১৪৯৭

৩. (ই.বি.কোষ-১/১২৭) (ভূমিকা– নাইলুল আওতার পৃ. ৫)

৪. (ভূমিকা– নাইলুল আওতার পৃ. ৫)

অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও ফিকহে গভীর পাণ্ডিত্য সর্বত্র আলোচিত বিষয় ছিল। একবার জনৈক আলিম তাঁকে একটি ইলমী প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন এ প্রশ্নটির ৬০টি জওয়াব দেয়া যেতে পারে। এরপর একের পর এক করে ষাটটি জওয়াব দিয়ে গেলেন।[৫]

৬৫২ হিজরীতে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মুনতাকাল আখবার (منتقى الاخبار)। এ গ্রন্থে তিনি প্রত্যেকটি ফিকহী অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীস সমূহের উল্লেখ করেছেন। যেগুলোর উপর মাযহাবের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে।[৬]

ত্রয়োদশ হিজরী শতকের শ্রেষ্ঠ আলিম ও মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু আলী আশ শাওকানী (রহ) নাইলুল আওতার (نيل الاوطار) নামে ৯ খণ্ডের (৪ ভলিউম) এই গ্রন্থটির ব্যাখ্যা লিখে গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর গভীরতা ও এর শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।[৭]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়ার পিতা শিহাবুদ্দীন আবদুল হালীমও একজন শ্রেষ্ঠ আলিম, মুহাদ্দিস ও হাম্বলী ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ ছিলেন। হাররান থেকে দামিশকে চলে আসার পরপরই তিনি দামিশকের উমাইয়া জামে মসজিদে দারসের সিলসিলা জারি করেন। দামিশকের এ কেন্দ্রীয় মসজিদটি ছিল দেশের শ্রেষ্ঠ উলামা, ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের কেন্দ্রস্থল। কাজেই দেশের শ্রেষ্ঠ আলিমগণের উপস্থিতিতে দারস দেয়া চাট্টিখানি কথা ছিলো না। তাঁর দারসের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি মুখে মুখে দারস দিতেন। সামনে কোন গ্রন্থ বা গ্রন্থের স্তূপ থাকতো না। সম্পূর্ণ স্মৃতির ওপর নির্ভর করে বড় বড় গ্রন্থের বরাত দিয়ে যেতেন। নিজের স্মৃতি শক্তির ওপর তাঁর নির্ভরতা ছিল অত্যধিক। এই সময় তিনি দামিশকের দারুল হাদীস আস সিকরিয়ায় শাইখুল হাদীস পদে নিযুক্ত হন। ৬৮২ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৮]

দামিশকে হিজরাত ও বাল্যকাল

তাতারী মোঙ্গলদের অন্যায় আক্রমণের মুখে পরিবারসহ তাঁর পিতা ৬৬৭ হিজরী, মুতাবিক ১২৬৮ সনের মধ্যভাগে জন্মস্থান হাররান (الحرّان) থেকে হিজরাত করে দামিশকে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[৯]

৫. (সংগ্রামী জীবন ৩৬ পৃ.) (ভূমিকা– নাইলুল আওতার পৃ. ৫)

৬. (সংগ্রামী জীবন-৩৫ পৃ.) (ভূমিকা– নাইলুল আওতার পৃ. ৫)

৭. (সংগ্রামী জীবন ৩৬ পৃ.)

৮. (সংগ্রামী জীবন, ৩৬-৩৭ পৃ.) (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-১৩/৩০৩)

৯. ই.বি. কোষ-১/১২৭; তাজকিরাহ-৪/১৪৯৬

দামিশকে পৌছার পর দামিশকবাসীরা তাঁদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। দামিশকের বিদগ্ধ সমাজ ইবনু তাইমিয়ার দাদা আবুল বারাকাত মাজদুদ্দীন আবদুস সালামের ইসলামী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত ছিল। আর ইবনু তাইমিয়ার (রহ) পিতা শিহাবুদ্দীন আবদুল হালিমের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও দামিশকে কম ছিলো না। কিছু দিনের মধ্যেই পিতা আবদুল হালিম উমাইয়া মসজিদে দারস ও দারুল হাদীস আস সিকরিয়ায় অধ্যাপনার দায়িত্ব লাভ করেন।

কিশোর ইবনু তাইমিয়া শীঘ্রই কুরআন মাজীদ হিফয করে হাদীস, ফিকহ ও আরবী ভাষা চর্চায় মশগুল হলেন। এই সঙ্গে তিনি পিতার সাথে বিভিন্ন ইসলামী মজলিসে শরীক হতে থাকেন। ফলে বিদ্যা শিক্ষার সাথে সাথে তাঁর জ্ঞান চর্চা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের গতিও দ্রুত হলো।

ইমামের খান্দানের সবাই অসাধারণ স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর পিতা ও দাদার কথা তো কিছু আগেই বলেছি। কিন্তু তাঁদের তুলনায় ইমাম তাকীউদ্দিন ইবনু তাইমিয়ার স্মরণ শক্তি ছিল আরো বেশি। শিশুকাল থেকে তাঁর অসাধারণ স্মরণশক্তি শিক্ষকদেরকে অবাক করে দিত। দামিশকে তাঁর স্মরণশক্তির চর্চা ছিল লোকদের মুখে মুখে।[১০]

জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান চর্চা

৮ম হিজরী শতকে ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ) ইসলামী পুনরুজ্জীবনের যে দায়িত্ব সম্পন্ন করেন তার মূলে ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং দীনী ইলমে অসাধারণ পারদর্শিতা। এ ব্যাপারে সমকালীন আলিম ও বিদগ্ধজনের মধ্যে তাঁকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা যায়। আল্লাহর রহমতে এই অতুলনীয় জ্ঞান তিনি লাভ করেন শিক্ষা, অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ) সাত বছর বয়সে শিক্ষায়তনে প্রবেশ করেন এবং মাত্র বাইশ বছর বয়সে তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে তোলেন। কুরআন, হাদীস, ফিকহ ও উসূলের সাথে সাথে তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শিতা অর্জন করার প্রতিও বিশেষ নজর দেন। তিনি দুশোর বেশি উস্তাদের কাছ থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। আল কুরআনের তাফসীরের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল সবচেয়ে বেশি। তিনি নিজেই বলেছেন, আল কুরআনের জ্ঞান আয়ত্ত করার জন্য তিনি ছোট বড় একশোরও বেশি তাফসীর গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। আল কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন, এর ওপর অত্যধিক চিন্তা গবেষণার কারণে আল্লাহ তা'আলা

১০. (সংগ্রামী জীবন-৩৮

আল কুরআনের গভীর তত্ত্বজ্ঞানের দরজা তাঁর জন্য উন্মুক্ত করে দেন। তাফসীর গ্রন্থ পাঠের মধ্যেই তিনি নিজের জ্ঞান স্পৃহাকে আবদ্ধ করে রাখতেন না। বরং সেই সাথে গ্রন্থ প্রণেতার কাছেও চলে যেতেন। তাঁর সাথে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমেও জ্ঞান বৃদ্ধি করতেন।[১১]

আল কুরআন, হাদীস ও ফিকহের সাথে সাথে কালাম শাস্ত্রেও তিনি গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। মূলত: সে সময় কালাম শাস্ত্রের চর্চা ছিল ব্যাপক। আর হাম্বলীদের সাথে এ শাস্ত্রের ছিল প্রচণ্ড বিরোধ। আর যেহেতু ইমাম ইবনু তাইমিয়ার পরিবারও ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী, সেহেতু প্রতিপক্ষের দর্শন ও যুক্তি পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করার জন্যই তিনি কালাম শাস্ত্র ভালভাবে অধ্যয়ন করেন। এর ফলে তিনি ইলমে কালামের ভেতরের দুর্বলতা, সেই শাস্ত্রের লেখকদের দুর্বল যুক্তি পদ্ধতি এবং এমন কি গ্রীক দার্শনিকদের গলদগুলোও সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হন। ইলমে কালাম গভীরভাবে অধ্যয়ন করার পরেই তিনি এর যাবতীয় গলদের বিরুদ্ধে লেখনি পরিচালনা করেন এবং শক্তিশালী যুক্তি প্রমাণের অবতারণা করে এমন কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন, যার জওয়াব সমকালীন লেখক ও দার্শনিকদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয়নি।[১২]

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রমাণ এই যে, তাঁর সম্পর্কে আলিমদের মুখে একটি কথা প্রবাদ বাক্যের মত প্রচলিত ছিল– كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فهو ليس بحديث যে হাদীসটি ইবনু তাইমিয়া জানেন না তা হাদীস হতে পারে না।[১৩]

ইবনু তাইমিয়ার (রহ) শিক্ষকদের নাম

ইমামুদ্দীন আল বারযালী (البرزالى) উল্লেখ করেছেন যে তাঁর উস্তাদের সংখ্যা একশতের অধিক।[১৪] তাঁর উস্তাদদের নামের তালিকায় রয়েছেন ইবনু আবিল য়ূসর, আল কামাল ইবনু আবদান, আল কামাল আবদুর রহীম, শামসুদ্দীন হাম্বলী, ইবনু আবিল খাইর, শরাফ ইবনুল কাওয়াস, আবু বকর আল হিরাবী, মুসলিম ইবনে আল্লান, শামসুদ্দীন ইবনু আতা হানাফী, জামালুদ্দীন ইবনু সায়রাফী, আন নাজীব ইবনুল মিকদাদ, আল কাসিম আল ইরবিলী, জামালুদ্দীন বাগদাদী,

১১. সংগ্রামী জীবন-৩৯

১২. (সংগ্রামী জীবন, পৃ. ৪০/ই.বি.কোষ-১/১২৭।

১৩. (সংগ্রামী জীবন-৮৩)

১৪. ভূমিকা ফাতওয়া, পৃ. ب।

মাজদুদ্দীন ইবনুল আসাকের, শাইখ ফখর আলী, শাইখ ইবনু শাইবান, যায়নব বিনতে মক্কী এবং শাইখ ইবনু আবদুদ দায়েম।[১৫]

ইবনু তাইমিয়ার (রহ) প্রশংসা

ইবনু শাকির লিখেছেন যে, তিনি অত্যন্ত মুত্তাকী এবং আবিদ ছিলেন। শরীয়াতের বিধানাবলীর দৃঢ় অনুসরণকারী ছিলেন। আল্লামা বলেন যে, তিনি জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করতেন না। আলিমদের তৎকালীন প্রচলিত জুব্বা ও পাগড়ী পরতেন না। তিনি সাধারণ পোশাক পরিধান করতেন।

ইবনু তাইমিয়া সম্পর্কে ইমাম আয্ যাহাবী লিখেছেন : তিনি সুশ্রী গৌরকান্তি সদাচারী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর স্কন্ধদ্বয় প্রশস্ত, স্বর উচ্চ এবং কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও ঘন ছিল। চক্ষু দু'টি যেন দু'টি বাকশক্তি সম্পন্ন জিহবা ছিল। তিনি আজীবন অবিবাহিত ছিলেন। সারা জীবনটাই তিনি দীনী সংস্কারের সংগ্রামে অতিবাহিত করেন। কিভাবে তৎকালীন মুসলিমগণকে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর দিকে আকৃষ্ট করা যায়, সেটাই ছিল তাঁর একমাত্র প্রচেষ্টা।[১৬]

তাঁর সমসাময়িক অসংখ্য বিজ্ঞজন তাঁর প্রশংসা করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন শাইখ আল কাজী আল খাত্তাবী, শাইখ ইবনু দাকীকিল ঈদ, শাইখ ইবনুন নাহহাস। মিশরের প্রধান বিচারপতি হানাফী কাযী শাইখ ইবনুল হারীরী, শাইখ ইবনুল যামলেকানী প্রমুখ।[১৭] এছাড়া হাফিয ইউসুফ মিয্যী (রহ) বলেন আমি ইবনু তাইমিয়ার (রহ) মত কাউকে দেখিনি। আর তিনিও তাঁর মত কাউকে দেখেননি। কুরআন হাদীস সম্পর্কে তাঁর চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও অনুসরণকারী আমি কাউকে দেখিনি।

কাযী আবুল ফাতাহ ইবনু দাকীকিল ঈদ (ابن دقيق العيد) বলেন, আমি ইবনু তাইমিয়ার সাথে মিলিত হয়ে তাঁকে দেখতে পাই যে, জ্ঞানের সমুদ্র যেন তাঁর চোখের সামনে। আমি তাঁকে বললাম, আমার ধারণাই ছিল না যে, আল্লাহ তা'আলা আপনার মত লোক সৃষ্টি করেছেন।

শাইখ ইবরাহীম আদদাক্বী (র) (الشيخ ابراهيم الدقى) বলেন : ইলমের ব্যাপারে ইবনু তাইমিয়াকে তাকলীদ করা যায় এবং তাঁর থেকে গ্রহণও করা যায়।

---

১৫. ই.বি.কোষ-১/১২৭/তাজকিরাহ-৪/১৪৯৬) আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-১৪/১৩৬
১৬. ই.বি. কোষ-১/১৩০
১৭. আল-বিদায়া-১৪/১৩৭

দীর্ঘদিন বেঁচে থাকলে তিনি সারা দুনিয়া জ্ঞান দিয়ে ভরে দেবেন। তিনি হকের উপরই রয়েছেন। অনেক লোক তাঁর শত্রুতে পরিণত হবে। কারণ তিনি তো নবুওয়াতী ইলমের উত্তরাধিকারী।

তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ইবনুল হারীরী (ابن الحريرى) বলেন : ইবনু তাইমিয়া যদি শাইখুল ইসলাম না হন তাহলে কে শাইখুল ইসলাম?

নাহ্‌বিদ আবু হাইয়্যান তাঁর সাথে মিলিত হয়ে বলেন : আমার চক্ষুদ্বয় তাঁর মত কাউকে দেখেনি।

হাফিয যামলেকানী (الزملكانى) বলেন, নবী দাউদ (আ)-এর জন্য আল্লাহ তা'আলা লোহাকে নরম করে দিয়েছিলেন। ইবনু তাইমিয়ার জন্য এভাবেই ইলমকে নরম করে দিয়েছে (ভূমিকা, ফাতওয়া)

প্রধান বিচারপতি আবুল হাসান আস সুবুকী (ابو الحسن السبكى) (র) শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়ার (রহ) তারীফ করে ইমাম আয্ যাহাবীর নিকট একটি চিঠি লিখেছেন। তাতে তিনি বলেছেন মহামান্য শাইখ সম্পর্কে আমার মন্তব্য হল ইবনু তাইমিয়ার মহান সম্মান, জ্ঞানের ব্যাপক, শারয়ী বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞানের ব্যাপারে অসীম দক্ষতা, তাঁর স্মৃতি শক্তি ও ইজতিহাদের তীক্ষ্ণতার সাথে সাথে তাঁর তাকওয়া, পরহেজগারী, ধার্মিকতা ও সত্যের সাহায্যের ব্যাপারে এই গোলাম সর্বদা তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন প্রকাশ করেই যাবে।

ইমাম আয যাহাবী বলেন : বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর দেয়া ফাতওয়ার সংখ্যা ৩০০ ভলিউম তো হবেই আরো বেশিও হতে পারে।[১৮]

ইমাম আয্ যাহাবী আরো বলেন, তাঁর ব্যাপারে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই যে, তাঁকে যখনই কোন ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হতো তখন জওয়াব দেয়ার সময় মনে হতো হাদীস যেন তাঁর চোখের সামনে এবং মুখের নিকট অবস্থান করছে।[১৯] আর রিসালাতুল মুসতাতরাফাহ (متطرفة) (১৪৪)

ইমাম তুফী (র) বলেন, জ্ঞানের ভাণ্ডার যেন তাঁর চোখের সামনেই ধরা থাকত। যা ইচ্ছে গ্রহণ করতেন আর যা ইচ্ছে পরিত্যাগ করতেন। একদা তাঁর সামনে কতগুলো কবিতা উল্লেখ করা হলে তিনি সাথে সাথে ১০৯টি কবিতা গুচ্ছ দ্বারা তার জওয়াব দিয়ে দেন। একই বৈঠকে তিনি অসংখ্য পৃষ্ঠা জওয়াব দিতেন।

---

১৮. ভূমিকা ফাতওয়া পৃ. ب - ج এর ج-و।

১৯. প্রাগুক্ত

ইমাম জামালুদ্দীন বলেন, ইবনু তাইমিয়ার (রহ) স্মরণশক্তি দেখে আশ্চর্য হতে হয়। তিনি কোন কিতাব একবার চোখ বুলিয়ে গেলে সবই তার স্মৃতিপটে অঙ্কিত হয়ে যেত। তিনি তাঁর রচনায় এগুলো হুবহু শব্দে অথবা অর্থটি বর্ণনা করতে পারতেন।[২০]

ইবনু তাইমিয়ার (রহ) জীবনের কিছু ঘটনা

বাইশ বছর পূর্ণ না হতেই তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত হয়। ৬৮১ হিজরী, মুতাবিক ১২৮২ সালে তাঁর পিতার মৃত্যুতে তিনি হাম্বলী ফিকহের অধ্যাপক রূপে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। উমাইয়া জামে মসজিদে প্রতি জুময়ার দিন তিনি কুরআনের তাফসীর করতেন। প্রাথমিক যুগের মনীষীদের অবলম্বিত পন্থার সমর্থনে তিনি কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে এমন যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ উপস্থিত করতেন যা তখন পর্যন্ত অভিনব ছিল। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে তাঁকে (قاضى القضاة) প্রধান বিচার পতির পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ৬৯১ হিজরী মুতাবিক ১২৯২ সালে তিনি হজ্জ সমাপন করেন। ৬৯৩ হিজরীতে এক ঈসায়ীর ব্যাপারে এক অপ্রীতিকর ঘটনার কারণে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। অবশ্য পরে মুক্তি পান। কায়রোতে ৬৯৮ হিজরী মুতাবিক ১২৯৯ সালে আল্লাহর صفات অর্থাৎ গুণাবলী সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের যে জওয়াব তিনি দিয়ে ছিলেন তাতে শাফেয়ী আলিমগণ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। জনমত তাঁর বিরুদ্ধে চলে যাওয়ায় তিনি অধ্যাপকের পদ হতে অপসারিত হন। এতদসত্ত্বেও সেই বছরই তিনি মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা প্রচারের জন্য নিযুক্ত হন এবং এই উদ্দেশ্যে পরের বছর কায়রো যান। এই পদাধিকার বলে তিনি দামিশকের নিকটবর্তী 'সাকহাফ' নামক স্থানে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেন।[২১]

৭০৪/১৩০৫ সালে তিনি ইসমাঈলী,[২২] নুসাইরী[২৩] ও হাকিমীসহ[২৪] সিরিয়ার

২০. প্রাগুক্ত

২১. ই.বি.কোষ-১/১২৭

২২. ইসমাঈলী সম্প্রদায় : শীয়াদের একটি শাখা। এটি কয়েকটি উপদলে বিভক্ত। ১৪৮ হিজরী/৭৬৫ সনের অনতিকাল পূর্বে ইমাম জাফর সাদিকের পুত্র ইসমাঈলের মৃত্যুর পরে শীয়াদের একটি সম্প্রদায় হিসেবে ইসমাঈলিয়া দলের উৎপত্তি হয়। এদের অধিকাংশ আকীদা কুরআন ও হাদীস বিরোধী। তাই এরা বাতিল ফিরকার অন্তর্ভূক্ত। (ই.বি. কোষ-১/১৮৭)

২৩. নুসাইরী সম্প্রদায় : সিরিয়ার চরমপন্থী শীয়া সসম্প্রদায়। মুহাম্মাদ ইবনে নুসাইর নামীরী আবদী ছিলেন এই সম্প্রদায়ের সর্বপ্রথম ধর্মতত্ত্ববিদ। দ্বিতীয় শতকে এ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব। এরাও বাতিল ফিরকার অন্তর্ভূক্ত। (ই.বি. কোষ-১/৫১৭)

২৪. হাকীমী সম্প্রদায় : মুতাযিলাদের একটি শাখা। একটি বাতিল দল। ৩য় শতক হিজরীতে এদের উৎপত্তি।

জাবালু কাসরাওয়ান-এর অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এরা হযরত আলীর (রা) ইমামতে ও ইসমতে বিশ্বাস করত, নামায পড়ত না, রোযা রাখত না, শুকরের মাংশ ভক্ষণ করত। সাহাবীদেরকে অবিশ্বাসী বলে গণ্য করত।

৭০৫ হিজরী ১৩০৬ সালে ইমাম ইবনু তাইমিয়া শাফেয়ী কাজীর সাথে কায়রো গমন করেন। সেখানে তিনি আল্লাহর প্রতি মানবীয় গুণ আরোপ করার জন্য সুলতান কর্তৃক অভিযুক্ত হন। বিচারক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পরিষদে পাঁচটি অধিবেশনের পর দুই ভাইসহ তিনি একটি পার্বত্য দুর্গের ভূগর্ভস্থ কারাগারে বন্দী হন। সেখানে তিনি দেড় বছর কাল অবস্থান করেন।[২৫]

৭০৭/১৩০৮ সালে ইত্তিহাদীয়া[২৬] দলের বিরুদ্ধে লিখিত তাঁর একটি পুস্তক সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তিনি নিজ মতের সমর্থনে যে প্রমাণ উপস্থিত করেন, তাতে তাঁর বিরোধীরা একেবারে নিরুত্তর হয়ে যায়। ফলে দামিশকে প্রত্যাবর্তনের শর্তে তিনি মুক্তি লাভ করেন। তিনি দামিশকের পথে একটি মাত্র মানযিল অতিক্রম করার পর তাঁকে বলপূর্বক কায়রোতে ফেরত এনে রাজনৈতিক কারণে "হাররা আদদায়লাম" এ কাজীর কারাগারে আরও দেড় বছর কাল অধিক রাখা হয়। তিনি এই সময় কারারুদ্ধ ব্যক্তিদেরকে ইসলামের নীতি আদর্শ শিক্ষাদানে ব্যয় করেন। তারপর অল্প কয়েক দিনের স্বাধীনতা ভোগের পর তাঁকে আট মাসকাল আলেকজান্দ্রিয়ার দুর্গে অবরুদ্ধ রাখা হয়। এরপর তিনি কায়রোতে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে তিনি সুলতান আন নাসির এর অনুরোধে তাঁর শত্রুদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতিমূলক ফাতওয়া দিতে অস্বীকৃতি জানান। এতদসত্ত্বেও তিনি এই সুলতানের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাতে অধ্যাপকের পদ লাভ করেন।[২৭]

৭১২/১৩১৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে তাঁকে সিরিয়া গমনকারী সৈন্যদলের সাথে যোগদানের অনুমতি দেয়া হয়। এভাবে তিনি সাত বছর সাত সপ্তাহ পরে জেরুসালেম হয়ে পুনরায় দামিশকে প্রবেশ করেন এবং পুনরায় অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেন।

৭১৮/১৩১৮ সালে সুলতান তাঁকে তালাক এর 'হালাফ' সম্পর্কে ফাতওয়া দিতে নিষেধ করেন। হালাফ বিত তালাক হলো এরূপ শপথ করা যে আমি অবশ্যই

২৫. (ই.বি. কোষ-১/১২৭, সংগ্রামী জীবন-৪৫)

২৬. ইত্তিহাদিয়া সম্প্রদায় : গূঢ় মিলনের ফলে সৃষ্টজীব স্রষ্টার সাথে এক হয়ে যায় এই মতবাদকে বলা হয় ইত্তিহাদিয়া। (ই.বি.কোষ-১/১১৬)

২৭. (ই.বি.কোষ-১/১২৭)

এমনটি করবো– অন্যথায় আমার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। ইমাম ইবনু তাইমিয়া এটাকে নিছক একটি শপথ বা অংগীকার মনে করতেন। এর ফলে স্ত্রী তালাক হবে না বলে তিনি ফাতওয়া দেন। এই প্রশ্নে তাঁর মত অপর তিনটি ফিকহী মাযহাবের ফকীহরা স্বীকার করেন না। তাঁর মতে, যে ব্যক্তি এরূপ হালাফ (শপথ) করে সে বিবাহের চুক্তি পালনে বাধ্য থাকবে। তবে কাজী তাকে নিজ বিবেচনা অনুযায়ী শাস্তি দিতে পারেন। তিনি সুলতানের এ নিষেধাজ্ঞা পালনে অস্বীকার করেন। একারণে ৭২০/১৩২০ সালের আগষ্ট মাসে সুলতান তাঁকে দামিশকের দুর্গে আবদ্ধ করেন। ৫ মাস ১৮ দিন পরে তাঁকে মুক্তি প্রদান করা হয়। তিনি আবার যথারীতি অধ্যাপনায় তৎপর হন।

শাবান ৭২৬/১৩২৬ সালের জুলাই মাসে তাঁর শত্রুরা দরবেশ ও নবীদের কবর যিয়ারাত এর উদ্দেশ্যে সফর করা নিষেধ সম্পর্কে ৭১০ হিজরীতে প্রদত্ত তাঁর ফাতওয়ার কারণে তাঁকে অভিযুক্ত করে দামিশকের দুর্গে তাঁর অন্তরীণের ব্যবস্থা করে। তাঁকে কারাগারে একটি স্বতন্ত্র কক্ষ প্রদান করা হয়। তাঁর নিরপরাধ ভ্রাতা শরফুদ্দীন আবদুর রহমান তাঁর সাথে স্বেচ্ছায় কারাগারে বাস করতে থাকেন। কারাবাসের সময় তাঁর সাহায্যে ইবনু তাইমিয়া "আল বাহরুল মুহীত" নামে আল কুরআনের একখানি তাফসীর, তাঁর প্রতিপক্ষের মতবাদের জওয়াব এবং যেসব অভিযোগে তাঁর কারাদণ্ড হয় সে সব বিষয়ে পুস্তকাদি রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর শত্রুরা পুস্তক রচনার কথা জানতে পেরে তাঁকে লিখন উপাদান হতে বঞ্চিত করে। এটি ছিল তাঁর প্রতি চরম আঘাত। এর পর তিনি সালাত ও কুরআন পাঠের মাধ্যমে শান্তি লাভের চেষ্টা করেন। অবশেষে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ২০ দিন পর ৭২৮ হিজরীর ২০ যুলকাদা ১৩২৮ সালের ২৭ শে সেপ্টেম্বর রবি ও সোমবারের মধ্যবর্তী রাতে মৃত্যু বরণ করেন।[২৮]

ইবনু তাইমিয়ার (রহ) চিন্তাধারা

আল্লামা ইবনু তাইমিয়া হাম্বলী মাযহাবভুক্ত ছিলেন। তবে তিনি অন্ধভাবে এ মাযহাবের সকল মত অনুসরণ করতেন না। বরং নিজেকে মুজতাহিদ মনে করতেন। ইবনু তাইমিয়া তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থে এই দাবী করেছেন যে, তিনি আল কুরআন ও হাদীসের শাব্দিক অর্থের অনুসরণ করেন। কিন্তু মতভেদযুক্ত বিষয়ের আলোচনা কালে কিয়াস প্রয়োগ অবৈধ মনে করেন না। প্রকৃত পক্ষে তাঁর একখানা পূর্ণ রিসালা কিয়াসমূলক যুক্তি প্রয়োগের পক্ষে লিখিত।

২৮. (ই.বি.কোষ-১/১২৮)

ইবনু তাইমিয়া বিদআত এর কঠোর সমালোচক ছিলেন।

দরবেশদের প্রতি অন্ধভক্তি ও কবর পূজা ও কবর যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে সফর করার প্রচলিত প্রথাকে তিনি জোরালো ভাষায় আক্রমণ করেন। তিনি বলতেন, নবী (সা) বলেছেন, কেবল কা'বা, বাইতুল মাকদিস ও আমার মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফর করবে না।' তাই তিনি কেবলমাত্র কবর যিয়ারাতের জন্য সফর করাকে গর্হিত কাজ মনে করতেন। তবে শর্ত সাপেক্ষে তিনি কবর যিয়ারাতকে সুন্নাত বলে গণ্য করতেন।[২৯]

সুফীদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল যে, তাঁরা দুশ্রেণী ভুক্ত। (১) যারা ধর্মপ্রাণ, অর্থ-সম্পদের প্রতি নির্মোহ এবং সচ্চরিত্র, এরা প্রশংসার যোগ্য। (২) যারা মুশরিক, বিদআতী এবং কাফির, এরা কুরআন ও সুন্নাহকে ত্যাগ করে মিথ্যা ভাষণ, ধোঁকাবাজী, ছলচাতুরী ও প্রতারণা অবলম্বন করে।

ইবনু তাইমিয়া কাব্য রচনাকে প্রশংসনীয় কাজ মনে করতেন না। কিন্তু তিনি সময় সময় তাঁর ভাবাবেগ কাব্যে প্রকাশ করতেন। এক সময় তিনি কতগুলো জ্ঞানমূলক প্রশ্নের উত্তর কাব্যাকারে দিয়ে ছিলেন। জনৈক ইয়াহূদীর পক্ষ থেকে তাকদীর সম্বন্ধে লিখিত আটটি শ্লোক এক সময়ে তাঁর নিকট প্রেরণ করা হয়। তিনি তৎক্ষণাত একই ছন্দে (طويل) ১৯৯/১০০ শ্লোকে এর উত্তর লিখে দেন।

রাশীদুদ্দীন উমার আল ফারানীও কবিতায় কতগুলো হেঁয়ালী লিখে ইবনু তাইমিয়ার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ৯৯টি শ্লোকে এর উত্তর দিয়েছিলেন।

আল্লামা ইবনু তাইমিয়া আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর ব্যাপারে আল কুরআনের আয়াত এবং হাদীসের বাহ্যিক শাব্দিক অর্থই গ্রহণ করতেন। কোন প্রকার অর্থ বিকৃতি বা তা'বীল করতেন না।[৩০] এতেই বিরুদ্ধবাদীরা আল্লাহর প্রতি মানবীয় গুণ আরোপ করা বলে ফতোয়া দিত।

বক্তৃতা ও গ্রন্থ রচনা উভয়ের মাধ্যমে তিনি খারেজী,[৩১] মুরজিয়া,[৩২] রাফিযী,[৩৩]

২৯. (ই.বি.কোষ-১/১২৮)

৩০. ইসলামী বিশ্ব কোষ-১/১২৮-১২৯

৩১. খারেজী : প্রথম দল ত্যাগী সম্প্রদায়। হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সিফফীন যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পরিশেষে সালিসীর মাধ্যমে যুদ্ধ সমাপ্তিকে কেন্দ্র করে যারা হযরত আলীর দল ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল তারাই খারেজী নামে পরিচিত।

৩২. মুরজিয়া : ইসলামের প্রাথমিক যুগে উদ্ভূত দলগুলোর একটি। এদের মত ছিল, কোন মানুষ যতই পাপ করুক না কেন তাতে ঈমান নষ্ট হবে না বা কোন ক্ষতি হবে না। (ই.বি. কোষ-২/২১৮)

৩৩. রাফিজী : শীয়াদের অন্যতম চরমপন্থী দল। এরা হযরত আবু বাকর (রা) ও উমার (রা) এর খিলাফত অস্বীকার করে। (ই.বি. কোষ-২/৩১৬)

কাদারী,[৩৪] মুতাযিলা,[৩৫] জাহমী,[৩৬] কাররামী,[৩৭] আশয়ারী[৩৮] প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। তিনি বলতেন, আল আশয়ারীর আকাইদ শুধু জাহমী,[৩৯] নাজজারী,[৪০] দিরারী[৪১] প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মতের সমন্বয় মাত্র। তিনি বিশেষ করে তাকদীর (কাদর), আল্লাহর নাম ও গুণাবলী, বিধান (احكام)-এবং পাপের শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত সতর্কবাণীর বাস্তবায়ন প্রভৃতি সম্বন্ধে আশয়ারীর মতবাদের বিরোধিতা করেন।[৪২]

তিনি তাহলীল (تحليل) নীতিকে (তালাকপ্রাপ্তা নারীকে বিবাহ করে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করা) প্রত্যাখ্যান করেন।

তাঁর মতে ঋতুকালে প্রদত্ত তালাক বাতিল।

আল্লামা ইবনু তাইমিয়া (রহ) ইমাম গাযালী[৪৩], মুহিউদ্দিন ইবনু

---

৩৪. কাদারী : আকীদা সম্পর্কে বিশেষ বাতিল মতবাদ পোষণকারী দল। এদের মত হল মানুষ কর্মের ব্যাপারে স্বাধীন। ভাল মন্দ কাজ মানুষ নিজেই সৃষ্টি করে। নিজেই এর জন্য দায়ী। এখানে আল্লাহর কোন হাত নেই। (ই.বি. কোষ-১/২৭৫)

৩৫. মুতাযিলা : ইসলামী ধর্ম বিশ্বাসের দলীলের উপর আকলকে প্রাধান্য দানকারী বাতিল মতবাদ। এরা কবীরা গুনাহকারীর জন্য ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী এক অবস্থার নীতিতে বিশ্বাস করে (১০৫-১৩১) হি. এদের কর্মতৎপতার যুগ। (ই.বি. কোষ-২/২০৯)

৩৬. জাহমী : জাহম ইবনে সাফওয়ান মৃ. ১২৮ হি. এর অনুসারীদেরকে জাহমী বা জাহমিয়া বলা হয়। এরা ছিল বাদ্যবাধকতা মতের ঘোর সমর্থক। (ই.বি. কোষ-১/৩৯৭)

৩৭. কাররামী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু কাররাম (মৃ. ২৫৫) এর অনুসারীদেরকে কাররামী বা কাররামিয়া বলা হয়। এ ব্যক্তি মনে করে যে খুদায়ী সত্তা একটি মৌলিক পদার্থ। (ই.বি. কোষ-১/৩০২)

৩৮. আশয়ারী : আবুল হাসান আশয়ারীর অনুসারীদেরকে আশআরী বলা হয় (২৬০-৩২৪ মৃ.)। মুতাযিলী মতবাদের বিরুদ্ধে এ দলটি সার্থকভাবে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত দাঁড়িয়েছিলো। (ই.বি. কোষ-১/৮৩)

৩৯. ৩৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৪০. নাজজারী : আল ইসাইল ইবন মুহাম্মাদ আবু আবদিল্লাহ আন নাজ্জার খলীফা আল মামুনের সময়ের একজন মুরজিয়া ও জাবারিয়া পন্থী ধর্ম তাত্ত্বিক ব্যক্তি ছিল। তার অনুসারীদেরকে নাজজারী বলা হয়। (ই.বি. কোষ-১/৪৮৭)

৪১. দিরারী : দিরার ইবনে আমর ও হাফসের অনুসারীদেরকে দিরারী বা দিরারিয়া বলা হয়। এটি মুতাযিলাদের একটি উপদল। এরা বাতিল।

৪২. (ই.বি.কোষ-১/১২৯)

৪৩. ইমাম গাযালী, আবু হামিদ মুহাম্মাদ। দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ। (৪৫০-৫০৫ হি.), (ই.বি.কোষ-১/৩৭৫)

আরাবী,[88] উমার ইবনুল ফরিদ[8৫] এবং সাধারণভাবে সুফীদের সমালোচনা করেছেন। ইমাম আল গাযালীর "আল মুনকিদ মিনাদ দালাল (المنقذ من الضلال) এবং এহইয়াউ উলুমিদ্দীন (احياء علوم الدين) গ্রন্থে বর্ণিত দার্শনিক মতবাদ গুলোই ছিল তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য। তিনি বলেন, সূফী ও মুতাকাল্লিমরা একই উপত্যকার বাসিন্দা। গ্রীক দর্শন ও এর মুসলিম প্রতিনিধি বিশেষ করে ইবনে সীনা[8৬] ও ইবনে সাবঈনকে[8৭] ইবনু তাইমিয়া (রহ) সর্বাপেক্ষা কঠোরভাবে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, দর্শন কি মানুষকে অবিশ্বাসের পথ প্রদর্শন করে না? ইসলামে যে সব ধর্ম নৈতিক মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে তার কারণ কি অনেকাংশে তাই নয়? (ই.বি.কোষ-১/১২৯-১৩০)

দীন ইসলাম মূলত: বিকৃত ইয়াহূদী ও খৃষ্ট ধর্মের স্থান অধিকার করতে প্রেরিত হয়েছে। এই কারণে ইবনু তাইমিয়া (রহ) স্বভাবতই উভয় ধর্মের আলোচনা করতে উদ্বুদ্ধ হন। ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম গ্রন্থে কতগুলো পদের অর্থ পরিবর্তনের অপরাধেও তিনি তাদেরকে অভিযুক্ত করেন। ইয়াহূদীদের উপাসনাগৃহ এবং খৃষ্টানদের গির্জা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের বিরুদ্ধেও তিনি পুস্তিকা রচনা করেন। (ই.বি.কোষ-১/১৩০

ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ) শিরক ও বিদয়াতের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন। দামিশকের নহরে ফুলুতের তীরে ছিল একটি বেদী। এ বেদীটি সম্পর্কে অদ্ভুত ধরনের অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত ছিল। জাহিল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিমদের জন্য এটি ফিতনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুসলিমরা সেখানে গিয়ে মানত করত। ৭০৪ হিজরীতে ইবনু তাইমিয়া (রহ) একদল মজুর ও পাথর কাটা মিস্ত্রি নিয়ে সেখানে হাজির হন। তাদের সহায়তায় বেদীটি কেটে টুকরোগুলো নদীতে নিক্ষেপ করেন। তিনি শিরক ও বিদয়াতের এই কেন্দ্রটিকে ধ্বংস করেন। এভাবে মুসলিমরা একটি বিরাট ফিতনা থেকে মুক্তি লাভ করে।[8৮] ইমাম ইবনু তাইমিয়া ছিলেন– কুরআন-সুন্নাহর পুরোপুরি অনুসরণকারী।

---

88. মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী সর্বেশ্বরবাদ নামক বাতিল মতবাদের প্রবক্তা ও বিখ্যাত সুফী (৫৬০-৬৩৮), (ই.বি.কোষ-১/১২০)।

8৫. উমার ইবনুল ফারিদ, একজন বিখ্যাত সুফী কবি (৫৭৭-৬৩২), (ই.বি.কোষ-১/১৬৫)।

8৬. ইবনে সীনা : আবু আলী আল হুসাইন ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে সীনা একজন বিখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, গাণিতিক, জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিক ছিলেন (৩৭০-৪২৮ হি.), (ই.বি.কোষ-১/১৪৪-১৪৫)।

8৭. ইবনে সাবঈন : গ্রীক দর্শনে প্রভাবিত একজন বিভ্রান্ত তাত্ত্বিক।

8৮. (সংগ্রামী জীবন, পৃ. ৪১ ও আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-১৩/৩৩৫

ইবনু তাইমিয়ার (রহ) সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা

❖ আল্লামা ইবনু তাইমিয়া ৬৬১ হিজরী, মুতাবিক ১২৬৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৭২৮ হিজরী, মুতাবিক ১৩২৮ সালে মৃত্যু বরণ করেন। এ সময় মুসলিম সাম্রাজ্য পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসগারের পূর্বপাড় থেকে শুরু করে পূর্ব দিকে ইন্দোনেশিয়া ও চীন সীমান্ত পর্যন্ত এবং উত্তরে রাশিয়ার সীমানা থেকে দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের কোল ঘেঁষে আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

❖ এ সমগ্র মুসলিম জনপদ একক কোন শাসন ব্যবস্থার অধীন ছিল না। ৬৫৬ সাল পর্যন্ত বাগদাদে আব্বাসী খিলাফাত বিদ্যমান ছিল। আব্বাসী খিলাফাতের অধীন এমন বহু প্রদেশ ছিল যেখানে তাঁদের অধীনস্থ সুলতানরা দেশ শাসন করত। কিন্তু এসব সুলতান নামে মাত্র আব্বাসী খিলাফাতের বশ্যতা স্বীকার করে স্বাধীনভাবেই দেশ পরিচালনা করত।

❖ এদের মধ্যে মধ্য এশিয়ার সুলতান ছিলেন আলাউদ্দিন খাওয়ারযাম শাহ। বোখারা, সমরকন্দ, হামাদান, কাযভীন, রায়, যানযান, মার্ভ, নিশাপুর প্রভৃতি শহর তাঁর অধীন ছির। কিন্তু ৬১৬ হিজরীতে তাতারীরা বোখারা আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়।

❖ অন্যদিকে পাক-ভারত উপমহাদেশে তখন কুতবুদ্দীন আইবেক-এর উত্তর সূরীরা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

❖ আর সিরিয়া ও মিশর ছিল মামলুক সুলতানদের অধীন। ৬৫৬ সালে তাতারীরা বাগদাদ ধ্বংস করে দিলে অবশিষ্ট আব্বাসীরা মিশরে আশ্রয় গ্রহণ করে।

❖ বস্তুত: ইমাম ইবনু তাইমিয়ার জন্মের তের বছর পূর্ব থেকেই মিশর ও সিরিয়ার উপর মামলুক (গোলাম বা ক্রীতদাস) সুলতানদের রাজত্ব শুরু হয়। এ মামলুক সুলতানরা ছিলেন সুলতান সালাহ উদ্দীন আইউবীর রাজ বংশের শেষ সুলতান আল মালিকুস সালিহ নাজমুদ্দীন আইউবী (মৃত্যু-৬৪৭) এর তুর্কী গোলাম। সুলতান নাজমুদ্দীন আইউবী তাদেরকে বীরত্ব ও বিশ্বস্ততার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর মিশরে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দেন। ৬৪৭ হিজরীতে আল মালিকুস সালিহ নাজমুদ্দীন আইউবীর মৃত্যুর পর তুরান শাহ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু ইয্যুদ্দীন (عزالدين) আইউবী তুর্কমানী নামক মামলুক তাঁকে হত্যা করে নিজেই সিংহাসনে বসেন এবং আল মালিকুল মুঈয (الملك المعز) নাম গ্রহণ করেন। আর এ সময়ই বাগদাদ ধ্বংস হয়। ৬৫৭ হিজরীতে ইযযুদ্দীন

আইউবীর গোলাম সাইফুদ্দীন কাতার সিংহাসন দখল করেন। এই মুসলিম সুলতানই সর্বপ্রথম অজেয় বলে কথিত তাতারীদেরকে পরাজিত করেন। পরের বছর সুলতান নাজমুদ্দীন আইউবীর দ্বিতীয় গোলাম রুকনুদ্দীন বাইবারস, সাইফুদ্দীন কাতারকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। বাইবারস অত্যন্ত শক্তিশালী সুলতান ছিলেন। একই সাথে তাতারী ক্রুসেডারদের সাথে লড়াই করে তাদেরকে বারবার পরাজিত করেন। তাঁরই শাসনামলে সিরিয়ায় ইমাম ইবনু তাইমিয়ার জন্ম হয়। ইমামের পনর বছর বয়সের সময় সুলতান রুকনুদ্দীন বাইবারসের মৃত্যু হয়। ৬৭৬ হিজরীতে ১৮ বছর রাজত্ব করার পর রুকনুদ্দীন বাইবারস মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ৩৩ বছরের মধ্যে ৯ জন সুলতান মিশরের সিংহাসনে বসেন। তাঁদের মধ্যে আল মালিকুল মানসুর কালাউন ছিলেন শক্তিশালী। তিনি ১২ বছর রাজ্য শাসন করেন। ৬৭৮ হিজরীতে তিনি তাতারীদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে শোচনীয় পরাজয় বরণে বাধ্য করেন। ৬৮৯ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। এর পর মিশরের সিংহাসনে পুতুল সরকারের আবির্ভাব হয়। অবশেষে ৭০৯ হিজরীতে আল মালিকুল মানসুর কালাউন এর পুত্র আল মালিকুন নাসির কালাউন তৃতীয় বার সিংহাসন দখল করেন। এবার তাঁর আসন স্থায়ী হয়। তিনি ৩২ বছর দোর্দণ্ড প্রতাপে শাসন কার্য পরিচালনা করেন। ইমাম ইবনু তাইমিয়া ছিলেন আসলে এই আল মালিকুন নাসির কালাউনের সমসাময়িক। তাঁরই আমলে ইমাম তাঁর তাত্ত্বিক ও সংস্কারমূলক কার্যাবলী জোরে শোরে শুরু করেন।

ইবনু তাইমিয়ার সমসাময়িক ধর্মীয় অবস্থা

ইমাম ইবনু তাইমিয়ার সময়ে জনগণের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা বিদ্যমান ছিল। শাসকদের মাঝেও এ চেতনা বিদ্যমান ছিল। কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী দেশ শাসন করা হতো। যদিও তাতে শিথিলতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তবে সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে বেশ কিছু অনাচার অনুপ্রবেশ করেছিল। তাওহীদ ও সুন্নাতের স্থানে বেশ কিছু শিরক ও বিদআত অনুপ্রবেশ করেছিল। বিভিন্ন স্থানে কবর পূজা, ব্যক্তি পূজা, বেদী পূজা শুরু হয়েছিল। সুফীরাও বিদআতী কাজ শুরু করেছিল। গ্রীক দর্শনের চর্চা ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল।' কুরআন ও সহীহ সুন্নাতের চর্চা হ্রাস পেয়েছিল। আলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে মাযহাবী দ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করেছিল। ইজতিহাদী শক্তি লোপ পেয়ে তদস্থলে তাকলীদী মানসিকতা পুরোপুরি স্থান করে নিয়েছিল। ফতোয়াবাজির চর্চা ব্যাপক হারে বেড়ে গিয়েছিল। খুঁটিনাটি

ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া তো লেগেই থাকতো। এমনি এক পরিবেশে ইমাম ইবনু তাইমিয়ার জন্ম।

ইবনু তাইমিয়ার (রহ) বিশিষ্ট ছাত্রদের নাম

ইমাম ইবনু তাইমিয়ার (রহ) অসংখ্য ছাত্র ও শিষ্য ছিলো। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন–

১। আল্লামা শামসুদ্দীন হাম্মাদ ইবনুল কাইয়্যিম জাওজিয়া (রহ), মৃত্যু- ৭৫১ হি.

২। আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইসমাইল ইবনে কাসীর (রহ), মৃত্যু- ৭৭৪ হি.

৩। আল্লামা ইউসুফ আল মিয্‌যী (রহ), মৃত্যু-৭৪২ হি.

৪। ইমাম শরফুদ্দীন আবদুল্লাহ (রহ), ৭০৫ হি.

৫। আল্লামা শামসুদ্দীন আয্‌ যাহাবী (রহ), মৃত্যু ৭৪৮ হি.

৬। আল্লামা ইবনে ফাদলিল্লাহ আল উমারী (রহ),

৭। আল্লামা মাহমুদ ইবনে আসীর (রহ) এবং

৮। আল্লামা কাসিম আল মুকরী (রহ)।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ

৬৯৩ হিজরীতে এক অপ্রীতিকর ঘটনায় তাঁকে সর্বপ্রথম মাঠে ময়দানে নেমে আসতে হয়। এ সময় আসসাফ নামক এক ঈসায়ী সম্পর্কে লোকেরা সাক্ষ্য দেয় যে, সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিরুদ্ধে অশোভন বাক্য উচ্চারণ করেছে। এ অন্যায় কাজ করার পর জনৈক ইবনু আহমদ নামক আরাবীর কাছে সে আশ্রয় নেয়। এ কথা জানার পর ইমাম ইবনু তাইমিয়া ও দারুল হাদীসের শাইখ যায়নুদ্দীন আল ফারুকী গভর্ণর ইযযুদ্দীন আইউবীর কাছে গিয়ে ঘটনার তদন্ত করে অপরাধীর শাস্তি দাবী করেন। গভর্ণর অপরাধীকে ডেকে পাঠান। লোকেরা আসসাফের সাথে একজন আরবীকে আসতে দেখে আরবীটিকে গালিগালাজ করতে থাকে। আরবীটি বলে যে, এ ঈসায়ী তোমাদের চেয়ে ভালো। এ কথা শুনে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে তাদেরকে ঢিল মারতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে বিরাট হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। গভর্ণর এ জন্য ইমাম ইবনু তাইমিয়া ও তাঁর সাথীকে দায়ী মনে করে তাঁদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

ঘটনার আকস্মিকতায় ও নাটকীয় পট পরিবর্তনে প্রভাবিত হয়ে ঈসায়ীটি ইসলাম গ্রহণ করে। গভর্ণর তার প্রাণের নিরাপত্তা বিধান করেন। পরে তিনি নিজের ভুল

বুঝতে পেরে ইমাম ও তাঁর সাথীকে কারামুক্ত করে তাঁদের নিকট মাফ চান। ইমামের জনপ্রিয়তা আরো বেড়ে যায়।[৪৯]

এ সময় ইবনু তাইমিয়া– الصارم المسلول على سابّ الرسول নামক কিতাব লিখেন। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-১৩/৩৩৬

তাতারী আক্রমণ ও ইবনু তাইমিয়া

ইরান ও ইরাকের তাতারী সম্রাট কাজান (قازان) ৬৯৪ হিজরী সনে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করার পরও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তার আক্রোশ ও অভিযান চলতে থাকে। ৬৯৯ হিজরীতে কাজান সিরিয়া আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেন। তাতারী আক্রমণের খবর শুনে সিরিয়া ও অন্যান্য শহরে ব্যাপক ভীতির সঞ্চার হয়। লোকেরা দলে দলে রাজধানী দামিশকের দিকে চলে আসতে থাকে। সে সময় যুগের শ্রেষ্ঠ আলিম ও মুজাদ্দিদ মর্দে মুজাহিদ ইবনু তাইমিয়া দামিশকে অবস্থান করছিলেন। অন্য দিকে মিশরের সুলতান বিপুল বাহিনী নিয়ে দামিশকের মুসলিমদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসলেন। ৬৯৯ হিজরীর ২৭ রবিউল আউয়াল কাজানের সাথে মিশরের সুলতানের যুদ্ধ হলো। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। সুলতান হেরে গেলেন। মিশরের সুলতান পরাজিত সেনাবাহিনী নিয়ে কায়রোর পথে রওয়ানা হয়ে যান। আর তাতারী আক্রমণের ভয়ে দুর্গ রক্ষক ব্যতীত গভর্ণরসহ সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি শহর ছেড়ে চলে গেল। .....এদিকে কাজানের সেনাদলের দামিশকে প্রবেশের সময় ঘনিয়ে আসছিল। এ অবস্থায় ইমাম ইবনু তাইমিয়া এবং শহরের নেতৃস্থানীয় লোকেরা বসে একটা ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন : ইমাম ইবনু তাইমিয়ার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল নগরবাসীদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার ফরমান লিখিয়ে আনবেন। রবিউল আখের মাসের তিন তারিখে পরাক্রমশালী তাতারী সম্রাট কাজানের সামনে হাজির হলেন ইসলামের দূত ইমাম ইবনু তাইমিয়া তাঁর দলবল নিয়ে। ইমাম ইবনু তাইমিয়া– আদল, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি সম্পর্কিত কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে যাচ্ছিলেন কাজানের সামনে। পরিশেষে কাজান তাঁকে দু'আ করতে বললেন এবং নগরবাসীদের জন্য নিরাপত্তার ফরমান লিখে দিলেন।[৫০]

---

৪৯. ই.বি.কোষ-১/১২৭, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-১৪/৩৭-৩৮, সংগ্রামী জীবন-৪৫)
৫০. (সংগ্রামী জীবন-৮২-৮৩)

মিশরের কারাগারে ইবনু তাইমিয়া

সেই সময় সিরিয়া ছিল মিশরের অধীন। সিরিয়ার মুসলিম জনগণের নিকট ইবনু তাইমিয়া (রহ) ছিলেন চোখের মণি। তাই অনেক সময় প্রকাশ্যে ইসলাম ও শরীয়াত বিরোধী কাজে বাধা সৃষ্টি করার ব্যাপারে সরকারের নিশ্চেষ্টতা ও নির্বিকারত্বের ক্ষেত্রে তিনি নিজের ছাত্রবৃন্দ ও জনগণের সহায়তায় এগিয়ে আসতেন। শারীয়া বিরোধী কাজ বলপূর্বক বন্ধ করে দিতেন। তবে মিশরের জনগণের মধ্যে তখনো তাঁর এ ধরনের প্রভাব বিস্তৃত হয়নি। অবশ্য পরে হয়েছিল। ৭০৫ হিজরীর কোন এক মাসে মিশর থেকে বিশেষ শাহী ফরমানের মাধ্যমে ইমাম ইবনু তাইমিয়াকে কায়রো চলে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। ইমামের ছাত্র ও শুভাকাঙ্ক্ষী মহল প্রমাদ গুনেন। গভর্ণর তাঁকে যেতে বাধা দেয়। তিনি সুলতানের সাথে পত্র ও দূতের মাধ্যমে এ ব্যাপারে আলোচনা করে ভুল ধারণা দূর করার দায়িত্ব নেন। কিন্তু ইমাম কারোর অনুগ্রহ গ্রহণ করতে চাননি। সবার অপরিসীম ভীতি ও আশঙ্কাকে পেছনে রেখে তিনি কায়রোর পথে রওয়ানা হন। ২২ শে রজমান জুময়ার দিন তিনি মিশরে পৌছেন। সেখানে কাজী ইবনুল মাখলুফ এর নির্দেশে তাঁকে কেল্লার বুরুজে কয়েক দিন আটক রাখার পর ঈদের রাতে মিশরের বিখ্যাত জুব কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়।[৫১]

তাতারী আক্রমণ রোধে ইবনু তাইমিয়া

হিজরী ৭০০ সালের সফর মাসে খবর রটলো যে তাতারী বাহিনী প্রথমে দামিশক পরে মিশর দখলের জন্য এগিয়ে আসছে। সিরিয়ায় লোকদের মধ্যে এক ভীতিকর অবস্থা সৃষ্টি হলো। যে যেভাবে পারে সব কিছু সস্তায় বেচে দিয়ে মিশরের দিকে রওয়ানা হল। ইমাম ইবনু তাইমিয়া জনসাধারণকে না পালিয়ে বরং তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। এদিকে খবর এলো মিশরের সুলতান সৈন্য দল নিয়ে সিরিয়ার সাহায্যে রওয়ানা দিয়ে আবার মিশর ফিরে গেছেন। এমতাবস্থায় ইবনু তাইমিয়া গভর্ণর এবং আমীরদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত করতে লাগলেন। তাঁরা ইমাম ইবনু তাইমিয়াকে মিশর যেতে অনুরোধ করলেন। তিনি যেন সুলতানকে বুঝিয়ে শুনিয়ে সিরিয়ার সাহায্যের জন্য নিয়ে আসেন। ইমাম ইবনু তাইমিয়া মিশরে গিয়ে সুলতানকে বুঝাতে সক্ষম হন। সুলতান নিজেই সসৈন্যে সিরিয়ার দিকে রওয়ানা দিলে পথি মধ্যে খবর পান যে তাতারী বাহিনী এ বছরের জন্য ফিরে গেছে। এ কথা শুনে লোকেরা পরম

৫১. (সংগ্রামী জীবন, পৃ. ৪৮) ৭০৭ হিজরীতে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন।

আনন্দে বাড়ি ফিরে গেল। ইবনু তাইমিয়া ২৭ জুমাদাল উলা ৭০০ হিজরীতে সিরিয়ায় ফিরে এলেন।[৫২]

মিশরের কারাগারে দাওয়াতী কাজ

মিশরের কারাগারে থাকা অবস্থায় তিনি দেখতে পান যে কয়েদীরা নিজেদের চিত্ত বিনোদনের জন্য নানা রকম আজে বাজে খেলা-ধূলায় মত্ত হয়ে পড়েছে। কেউ তাস, কেউ দাবায় মশগুল। নামাযের দিকে তাদের কোন খেয়াল নেই। নামায কাযা হয়ে যাচ্ছে খেলার ঝোঁকে। ইমাম ইবনু তাইমিয়া এতে আপত্তি জানান। তিনি কয়েদীদেরকে নামাযের প্রতি আকৃষ্ট করেন। আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশগুলো সম্পর্কে তাদেরকে সজাগ করেন এবং এসবের জন্য তাদেরকে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করার পরামর্শ দেন। এভাবে কিছু দিনের মধ্যে জেলখানার কয়েদীদের মাঝে দীনী ইলমের এমন চর্চা শুরু হয়ে গেল যে, সমগ্র কারাগারটিই একটি মাদরাসায় পরিণত হয়ে গেলো। কারাগারের কর্মচারী ও কয়েদীরা ইমাম ইবনু তাইমিয়াকে মনে প্রাণে ভালোবেসে ফেললো। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, এ সময় অনেক কয়েদী তাদের কারামুক্তির ঘোষণা শুনার পরও জেলখানা ছেড়ে যেতে চাইতো না। তারা তাঁর কাছে আরো কিছু দিন থেকে যেতে আর্জি পেশ করতো।[৫৩]

সর্বেশ্বরবাদ ও অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

৮ম হিজরী শতকে ইমাম ইবনু তাইমিয়ার সময় মুসলিম সুফী ও দার্শনিকদের মধ্যে দু'টি দার্শনিক মতবাদ প্রবল হয়ে ওঠে। ইমাম ইবনু তাইমিয়াকে এ'দুটি ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে বিরাট সংগ্রাম করতে হয়। এ মতবাদ দু'টি হচ্ছে, ওয়াহদাতুল উজুদ[৫৪] (সর্বেশ্বরবাদ) এবং হুলুল ওয়া ইত্তিহাদ (অদ্বৈতবাদ)।[৫৫] পরবর্তীকালে উপমহাদেশের সুফীদের মধ্যেও এ মতবাদ দু'টি প্রবল হয়ে ওঠে। মুজাদ্দিদে আলফে সানী হযরত সাইয়্যেদ আহমদ সরহিন্দীকে[৫৬] এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড

৫২. (সংগ্রামী জীবন-৭২-৭৩)

৫৩. (সংগ্রামী জীবন-৭২-৭৩)

৫৪. ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ (সর্বেশ্বরবাদ)। এর প্রবক্তা ছিলেন হুমাইন ইবনে মানসুর। তাঁর মতে সকল কিছুর মাঝেই ঈশ্বর বিদ্যমান। এটি একটি বাতিল মতবাদ। তাঁকে শূলবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।

৫৫. "হুলুল ও ইত্তিহাদ (অদ্বৈতবাদ)। এই মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন মুহীউদ্দীন ইবনু আরাবী। এই মতবাদের সারকথা 'আল্লাহর সাথে মানবাত্মার গূঢ় মিলন।' এটিও একটি ভ্রান্ত মতবাদ।

৫৬. সংগ্রামী জীবন-৫১

সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। অদ্বৈতবাদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন মুহিউদ্দীন ইবনু আরাবী (মৃ. ৬৩৮ হিজরী)।[৫৭]

ইবনু আরাবীর পরপরই এ দর্শনের আরো কয়েকজন বড় বড় প্রবক্তা দেখা যায়। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ইবনু সাবঈন (ابن سبعين),[৫৮] সদরুদ্দীন কুনুবী,[৫৯] বিলয়ানী[৬০] ও তিলমিসানী। এদের মধ্যে তিলমিসানী কেবল বক্তব্য রেখেই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি বাস্তবেও এ দার্শনিক নীতি মেনে চলতেন। তাঁদের মতে স্রষ্টাই হচ্ছে সৃষ্টি এবং সৃষ্টিই হচ্ছে স্রষ্টা। তাই তাদের মতে বনি ইসরাঈলের যারা বাছুর পূজা করেছিল তারা আসলে আল্লাহকেই পূজা করেছিল। তাদের মতে ফিরআউনের (انا ربكم الاعلى) "আনা রাব্বুকুমুল আলা" (আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রব) এ দাবীটি যথার্থ ছিল। ইবনু আরাবী হযরত নূহ (আ)-এর সমালোচনা করে বলেন, তাঁর কাফির কওম মূর্তি পূজার মাধ্যমে আসলে আল্লাহকেই পূজা করছিল। আর তাঁর সময়ের তুফান ছিল আসলে মারেফাতে ইলাহীর তুফান। এ তুফানের মধ্যে তারা ডুবে গিয়েছিল। এদের মধ্যে হালাল-হারামের কোন পার্থক্য ছিল না। তিলমিসানী ও তার অনুসারীরা মদপান করত। সমস্ত হারাম কাজ করত।

ভারতীয় বেদান্তবাদ ও বৌদ্ধ মহা নির্বানবাদ প্রভাবিত এই ওয়াহদাতুল উজুদ ও হুলুলী মতবাদের প্রকাশ্যে বিরোধিতা করাকে ইমাম ইবনু তাইমিয়া তাতারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের মতোই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। তিনি এসব মতবাদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা ও কলমের যুদ্ধ পরিচালনা করে এদের মুখোশ উন্মোচন করেন। তাদের মতবাদটিকে বাতিল বলে সাব্যস্ত করেন। ইসলামের নামে প্রচলিত এসব ভ্রান্ত মতবাদের কঠোর সমালোচনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনু তাইমিয়া কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর চক্ষুশূলে পরিণত হন। একদল তথাকথিত তাত্ত্বিকও তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। এক পর্যায়ে তারা সরকারের সহায়তা লাভে সমর্থ হয়। পরিণতিতে ইমাম ইবনু তাইমিয়াকে মিশরে কারাবরণ করতে হয়। ৭০৭ হিজরীতে রবিউল আউয়াল মাসে তিনি মুক্ত হন। (সংগ্রামী জীবন-৪৪-৪৯)

৫৭. সংগ্রামী জীবন : ৫২-৫৩

৫৮. ইবনু সাবঈন : গ্রীক দর্শনে প্রভাবিত একজন ভ্রান্ত তাত্ত্বিক।

৫৯. কুনুবী : ইবনু আরাবীর অনুসারী একজন ভ্রান্ত চিন্তাবিদ।

৬০. বিলয়ানী : ইবনু আরাবীর অনুসারী আরেকজন ভ্রান্ত তাত্ত্বিক।

৭০৭ হিজরী সনে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করার পরও ইমাম ইবনু তাইমিয়া অদ্বৈতবাদ ও সর্বেশ্বরবাদ এর বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। বিশেষ করে মিশরের প্রখ্যাত সুফী কবি আবুল ফারেজ (মৃত্যু-৬৩২) ছিল এ মতবাদের একজন বলিষ্ঠ প্রবক্তা। তার প্রচেষ্টায় কাব্যের সুষমামণ্ডিত হয়ে এ মতবাদটি সাধারণ মানুষ ও সুফী সমাজের মধ্যে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল। মিশরের বিপুল সংখ্যক সুফী ও মাশায়েখ এ মতবাদে প্রভাবিত ছিল। ইমাম ইবনু তাইমিয়া মিশরের বুকে বসে প্রকাশ্যে এ মতবাদের বিরোধিতা শুরু করে দিলেন। এ মতবাদকে তিনি আল কুরআন, হাদীস ও ইসলামী শারী'আর সম্পূর্ণ পরিপন্থী বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁর এ বলিষ্ঠ ও ব্যাপক সমালোচনা সুফী মহলে বিপুল ক্ষোভের সঞ্চার করে। মিশরের মশহুর শায়খে তরিকাত ইবনু আতাউল্লাহ ইস্কান্দারী সুফীদের প্রতিনিধি হিসাবে দুর্গে গিয়ে সুলতানের কাছে ইমামের বিরুদ্ধে নালিশ করেন। সুলতান দারুল আদলে সভার আয়োজন করে এ অভিযোগটির যথাযথ তদন্তের নির্দেশ দেন। ইবনু তাইমিয়াকে এ সভায় আহ্বান করা হয়। কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ বলিষ্ঠ যুক্তি এবং যাদুকরী বক্তৃতা শ্রোতাদেরকে বিমোহিত করে। সভাস্থলের সবার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রচেষ্টা আপাতত স্থগিত হয়ে যায়। কিন্তু বাতিল সুফীদের অভিযোগের তীব্রতা ক্রমশ বাড়তেই থাকে। পরিশেষে সরকার তাঁকে নজরবন্দি করে রাখে। কিন্তু কিছু দিন পর উলামা ও ফকীহদের এক সম্মেলনে ইমামকে মুক্তি দেবার জন্য একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সরকার তাঁকে ৭০৭ হিজরীর শেষের দিকে মুক্তি দান করেন।[৬১]

আলেকজান্দ্রিয়ায় নজরবন্দি

৭০৮ হিজরীতে বিভিন্ন কারণে নাসিরুদ্দীন কালাউন রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান। ফলে রুকনুদ্দীন বাইবারস শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। সুলতান বাইবারসের আধ্যাত্মিক গুরু ও দীনী ব্যাপারে পরামর্শদাতা ছিলেন শায়খ নাসরুল মমবাজী। ইমাম ইবনু তাইমিয়া ছিলেন এই শায়খের আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের প্রধান সমালোচক। আবার অন্য দিকে ইমাম ইবনু তাইমিয়াকে সাবেক সুলতানের প্রিয়পাত্র মনে করা হতো। কাজেই বিরোধীরা এবার তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার পূর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার

৬১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-১৪/১২ ও ৩৫

করতে তারা মুহূর্ত কাল বিলম্ব করেনি। কাজেই রুকনুদ্দীন বাইবারস ক্ষমতাসীন হবার সাথে সাথেই ইমাম ইবনু তাইমিয়াকে আলেকজান্দ্রিয়ায় পাঠিয়ে সেখানে নজরবন্দী করে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। ৭০৯ হিজরীর সফর মাসের শেষের দিকে তাঁকে আলেকজান্দ্রিয়ায় নজরবন্দী করে রাখা হয়।[৬২]

আলেকজান্দ্রিয়া ছিল সুফী সাধকদের প্রাচীন কেন্দ্র। সুফীদের গুমরাহ দর্শনের প্রভাব জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইমাম ইবনু তাইমিয়া সুফী ও জনগণের চিন্তা ও কর্মের এই গলদ দূর করার সংকল্প করেন। প্রথমে আল কুরআন ও হাদীসের দারসের মাধ্যমে নিজের একটি ছাত্র ও সমর্থক গ্রুপ তৈরি করেন। ধীরে ধীরে তাঁর এ গ্রুপের কলেবর বেড়ে যেতে থাকে। সাধারণ মানুষ দলে দলে তাঁর কাছে আসতে থাকে। ইমাম মহা উৎসাহে জনগণের চিন্তার পরিশুদ্ধির কাজে নেমে পড়েন। এই সঙ্গে শারীআতের অনুশাসন অনুযায়ী তাদের কর্ম ও চরিত্র গড়ে তুলতে থাকেন। তিনি মাত্র আট মাস এ শহরে অবস্থান করেন। এ স্বল্প সময়ের মধ্যেই বিরোধী মহলের সমস্ত শক্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। জনসাধারণ ও শিক্ষিত প্রভাবশালী মহলের বিরাট অংশ সুফীদের বাতিল দর্শন হতে তাওবা করে খাঁটি দীনে ফিরে আসেন।

মাত্র এগার মাস পর সুলতান রুকনুদ্দীন বাইবারস শাসন কার্যে ইস্তফা দিয়ে দেশ ত্যাগ করেন এবং সুলতান নাসিরুদ্দীন কালাউন শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি ক্ষমতায় এসেই ইমাম ইবনু তাইমিয়াকে ৭০৯ হিজরীর শাউয়াল মাসে মুক্ত করে দেন।[৬৩]

এরপর তিনি সম্মানের সাথে মিশরে এর পরে সিরিয়ায় অবস্থান করেন। পরে তাঁকে ৭২৫ হিজরীতে পুনরায় বন্দী করা হয়।

জিম্মীদের পোশাক পরিবর্তনের বিরুদ্ধে রাজদরবারে সোচ্চার কণ্ঠ

ইতোপূর্বে মিশর ও সিরিয়ার আলিমগণ খৃস্টানদের গুপ্তচর বৃত্তি বন্ধ করা ও তাদের সুপরিকল্পিত ধ্বংসযজ্ঞ প্রতিহত করা ও মুসলিমদের মধ্যে তাদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য তাদেরকে নীল পাগড়ী ও মুসলিমদের সাদা পাগড়ী পরিধান করার ব্যাপারে বিশেষ বিধান জারি করেছিলেন। একদা মিশরের সুলতান

৬২. (সংগ্রামী জীবন-৪৪, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-১৪/৩৩
৬৩. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-১৪/৩৩

কর্তৃক আল্লামা ইবনু তাইমিয়ার সম্মানার্থে আহুত এক দরবারে প্রধান মন্ত্রী প্রস্তাব পেশ করলেন যে, এখন থেকে মুসলিমদের ন্যায় অমুসলিমরাও সাদা পাগড়ী পরবেন। এতে সকল আলিম চুপ থাকলেও ইমাম ইবনু তাইমিয়া এর বিরোধিতা করলেন। এ কারণে এ প্রস্তাব আর পাশ হয়নি। এভাবে মুসলিমরা আর একটি কূট চাল থেকে রক্ষা পেল। এটা ৭০৯ হিজরীর ঘটনা।[৬৪]

বাতিল আকীদা ও সন্ত্রাস নির্মূলে ইবনু তাইমিয়া

সীমান্ত এলাকার জারদ ও কাসরাওয়ান নামক পার্বত্য অঞ্চলে কিছু উপজাতি ছিল ইসলাম ও মুসলিমদের ঘোর বিরোধী। এরা মূলত ছিল খৃষ্টান এবং শিয়াদের বাতেনী, ইসমাঈলী, দ্রুজ,[৬৫] নুসাইরী প্রভৃতি গুমরাহ ফিরকার অন্তর্ভুক্ত। ৬৯৯ হিজরীতে তাতারীরা যখন সিরিয়ায় প্রবেশ করে তখন এই গুমরাহ উপজাতিরা তাদেরকে সাহায্য করে আর মুসলিমদের ক্ষতি করে। পরাজিত মুসলিম সেনাদেরকে হত্যা করে, তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে যায়। একদা ইমাম ইবনু তাইমিয়া শুনতে পেলেন যে মিশরের সুলতানের সহকারী জামালুদ্দীন সিরিসী সৈন্য নিয়ে পার্বত্য এলাকার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। ইমাম ইবনু তাইমিয়া এই সুযোগ হাত ছাড়া করলেন না। তিনি তাঁর সেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়ে নায়েবে সুলতানের সঙ্গী হলেন। মিশর সুলতানের সহকারীর উপস্থিতির খবর শুনে গুমরাহ উপজাতি গুলো দলে দলে ইবনু তাইমিয়ার কাছে হাজির হতে থাকলে ইমাম তাদের তাওবা করালেন। তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা দিলেন। এরা গুমরাহী ত্যাগ করে হকের দিকে চলে আসে। আল্লাহর রহমতে এটা ছিল ইবনু তাইমিয়ার একটি বিরাট অবদান।[৬৬]

আহমাদিয়া গ্রুপ ও ইবনু তাইমিয়া

৭০৫ হিজরী জুমা: উলা ৯ তারিখ শনিবার আহমাদিয়া গ্রুপ নামক ভণ্ড সুফীদের একটি দল সরকারের নিকট আবেদন করে যে, ইবনু তাইমিয়াকে যেন প্রচারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় এবং তাদেরকে যেন তাদের অবস্থায় থাকতে দেয়া হয়। এতে ইবনু তাইমিয়া আপত্তি করেন। এতে তারা ইবনু তাইমিয়াকে

---

৬৪. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-১৪/৩৩

৬৫. দ্রুজ সম্প্রদায় : লেবানন ও সিরিয়ার একাংশে বসবাসকারী একটি সম্প্রদায়। এদের মতবাদে বাতেনিয়া শীয়া, হিন্দু ও খৃষ্টানদের মতবাদের সমাহার দেখা যায়।

৬৬. (সংগ্রামী জীবন-১৮-১৯) আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৪/৭-৮

আগুনে প্রবেশের মাধ্যমে নিজের হক্কিয়াত প্রমাণের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। ইবনু তাইমিয়া (রহ) তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বলেন, এ সবগুলো হলো শয়তানী চালবাজী। যদি তারা আগুনে প্রবেশ করতে চায় তাহলে প্রবেশের পূর্বে সাবান ও অন্যান্য খড়ি জাতীয় বস্তু দিয়ে ভাল করে ঘসে মেজে গোসল করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে কুরআন হাদীসই হলো হক হবার প্রমাণ, আগুনে প্রবেশ নয়। পরিশেষে তারা পরাজিত হয় এবং নিজেদের শরীর থেকে লৌহ বেড়ি খুলে ফেলতে রাজি হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বের হয়ে গেলে তাদেরকে হত্যা করা হবে। এছাড়া তিনি তাদের বাতিল আকীদাগুলো চিহ্নিত করে একটি কিতাবও লিখেন। বস্তুত: ইমাম ইবনু তাইমিয়ার হাতে আল্লাহ তা'আলা সুন্নাতকে বিজয়ী করলেন আর বিদআত দূরিভূত করলেন।

তাতারীদের অঙ্গীকার ভঙ্গ, নির্যাতন এবং ইবনু তাইমিয়ার সাহসিকতা

কিছু কালের মধ্যেই তাতারীরা তাদের নিরাপত্তার ফরমান ভঙ্গ করে শহরের বাইরে যুলম নির্যাতন শুরু করে। নগরের উপর তাদের আধিপত্য পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়। কেবলমাত্র "আরজাওয়াশ" দুর্গটি তখনো স্বাধীনভাবে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দুর্গাধিপতি কোন ক্রমেই বশ্যতা স্বীকার করতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন না। ঐতিহাসিক ইবনু আসীর লিখেছেন : "ইমাম ইবনু তাইমিয়ার নির্দেশই দুর্গাধিপতির মনে সাহস সঞ্চার করেছিল। ইমাম তাঁকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, যতক্ষণ কেল্লার একটি ইটও অক্ষত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত অস্ত্র সংবরণ করবেন না। কেল্লার দরজা কোন ক্রমেই তাতারীদের জন্য খুলে দেবেন না। দুর্গাধিপতি শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত এ নির্দেশ মেনে চলেন। ফলে তাতারীরা এ দুর্গটি আর দখল করতে পারেনি। অগত্যা কাজান তার বাহিনী নিয়ে ইরাকের দিকে চলে যায়।[৬৭]

সাকহাফ (سقحف) যুদ্ধ ও ইবনু তাইমিয়া

৭০২ হিজরীর রজব মাসে খবর এলো যে সিরিয়ায় তাতারী আক্রমণ অত্যাসন্ন। সারা সিরিয়া জুড়ে মহা আতঙ্ক দেখা দিল। লোকেরা মিশরের পথে হিজরাত করতে শুরু করল।

১৮ই শা'বান সুলতান রুকনুদ্দীন বাইবারস ও অন্যান্য আমীরদের নেতৃত্বে মিশরীয় সৈন্যবাহিনী সিরিয়ায় এসে উপস্থিত হলো। এর আগে মিশরীয় সৈন্যবাহিনীর পৌছতে দেরি দেখে, সিরিয়ার আমীররা ৫ই শা'বান তাতার

৬৭. (সংগ্রামী জীবন-৭০)

বাহিনীর সাথে নিজেরাই যুদ্ধ করার জন্য শপথ গ্রহণ করেন। ইবনু তাইমিয়া এ সময় আমীরদের উদ্দেশ্যে কসম খেয়ে বলেছিলেন যে আপনারা এ যুদ্ধে অবশ্যই জয়লাভ করবেন। ইনশাআল্লাহ্। রমজান মাসের ২ ও ৩ তারিখে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে মিশরীয় ও সিরিয়ার যৌথ সৈন্যবাহিনীর কাছে তাতার বাহিনী দারুণভাবে পরাজিত হয়। তারা পেছনে অগণিত লাশের স্তূপ রেখে পালিয়ে যায়। এর পর তাতারীরা আর কোন দিন সিরিয়ার দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস পায়নি।

আল্লামা ইবনু তাইমিয়া এই যুদ্ধে সরাসরি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সুলতান বাইরারস ইবনু তাইমিয়াকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন মিশরীয় বাহিনীর সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থান করেন। কিন্তু ইবনু তাইমিয়া (রহ) এই বলে এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন যে, সুন্নাত হল এই যে প্রত্যেক ব্যক্তি তার জাতির ঝাণ্ডার তলে অবস্থান করবে। আমরা যেহেতু সিরিয়া বাহিনীর সদস্য, অতএব আমরা তাদের সাথেই অবস্থান করব। এই সময় তাতারী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে উলামা সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য দেখা দিল। তাদের কথা হলো এরা তো মুসলিম। এরা বিদ্রোহীও নয়। কেননা এরা তো ইমামের আনুগত্যের সীমায়ই আসেনি। অতএব বিদ্রোহী হবার সুযোগ কোথায়? এ সময় ইবনু তাইমিয়া তাদের বুঝালেন যে এরা খারেজী সম্প্রদায়ের অনুরূপ। কারণ খারেজীরা নিজেদেরকে হযরত আলী (রা) ও হযরত মুয়াবিয়ার (রা) চেয়ে খিলাফাতের অধিক হকদার বলে বিশ্বাস করত। তাই তারা তাদের দু'জনের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেছিল। আর তাতারীরা নিজেদেরকে সত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অন্য সকল মুসলিমদের চেয়ে অধিক হকদার মনে করে। আর তারা অসংখ্য অন্যায় ও অপরাধের সাথে সাথে মুসলিমদের দোষ চর্চা করে বেড়াচ্ছে। অতএব এরা খারেজীদের চেয়েও জঘন্য। ইবনু তাইমিয়ার এই যুক্তি শুনে সবাই একমত হয়ে যায়।[৬৮]

বুলাই খানের দরবারে ইবনু তাইমিয়া

কাজান চলে যাবার পর দ্বিতীয় তাতারী আমীর বুলাইখান দামিশকের চারপাশে লুটতরাজ শুরু করে। বহু মুসলিম ছেলেমেয়ে গোলাম ও বাঁদীতে পরিণত হয়। দামিশক শহর থেকে সে বহু টাকা পয়সা আদায় করলো। অবস্থা চরম পর্যায়ে পৌঁছলে ইমাম ইবনু তাইমিয়া বুলাই খানের সেনানিবাসে হাজির হন। বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে তার সাথে আলাপ করেন, বিপুল সংখ্যক বন্দীকে মুক্ত করে নিয়ে

৬৮. (সংগ্রামী জীবন-৭২)

ফিরে আসেন। এদিন দামিশকের কেল্লাধিপতির পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হলো, সিরিয়ার সাহায্যের জন্য মিশরীয় সেনাবাহিনী দামিশকের দিকে এগিয়ে আসছে। পরের দিন বুলাই খান তার সেনাবাহিনী নিয়ে শহর ত্যাগ করে চলে গেলো। এ সময় দামিশকের কোন দায়িত্বশীল গভর্ণর বা শাসক ছিল না। তাতারী হামলায় নগর প্রাচীর স্থানে স্থানে ভেঙ্গে পড়েছিল। "আরজাওয়াশ" কেল্লার অধিপতি নগরবাসীদেরকে রাতে নিদ্রা না গিয়ে নগর প্রাচীর পাহারা দেওয়ার অনুরোধ জানান। লোকদের সাথে ইবনু তাইমিয়াও রাতের পর রাত ভগ্ন প্রাচীর পাহারা দিতে থাকেন।[৬৯]

ভণ্ড সুফী ও ফকীরদের উচ্ছেদ

❖ ৭০৪ হিজরীর রজব মাসে ইমাম ইবনু তাইমিয়ার নিকট আল মুজাহিদ ইবরাহীম আল কাত্তান নামক এক বৃদ্ধকে হাজির করা হল। তার পরিধানে ছিল সু প্রশস্ত আজানু লম্বিত শততালি দেয়া পোশাক। মাথায় ছিল সন্ন্যাসীদের ন্যায় দীর্ঘ জটওয়ালা চুল। হাতের নখগুলো ছিল অতিদীর্ঘ। গোঁফগুলো সুন্নাতের খেলাপ এত লম্বা ছিল যে মুখ ঢেকে গিয়েছিল। সে সর্বদা ফাহিশা কথা বলত। নেশা দ্রব্য ও অন্যান্য হারাম বস্তু ভক্ষণ করা তার সার্বক্ষণিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। আল্লামা ইবনু তাইমিয়ার নির্দেশে লোকেরা তার আল খেল্লা টুকরো টুকরো করে দিল। মাথার চুল ও গোঁফ ছেঁটে দিল। নখগুলো কেটে ফেলল। অত:পর তাকে তাওবা করিয়ে ছেড়ে দিল।[৭০]

❖ এরপর ইবনু তাইমিয়ার নিকট হাজির করা হলো শাইখ মুহাম্মাদ আল খাব্বাজ আল বালাসীকে। এ ব্যক্তিও নিজেকে বড় সুফী দাবী করত। অথচ সে অবৈধ বস্তু ভক্ষণ করত, অমুসলিমদের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখত, স্বপ্নের মনগড়া ব্যাখ্যা করত এবং অবান্তর কথা বলে বেড়াত। শাইখ ইবনু তাইমিয়া তাকে তাওবা করান এবং এরকম কাজ না করার ব্যাপারে অঙ্গীকার নামাও লিখিয়ে রাখেন।

ইবনু তাইমিয়ার তাজদীদী কার্যক্রম

আল্লামা ইবনু তাইমিয়া (রহ) একজন মহান মুজাদ্দিদ ছিলেন। তিনি তাঁর যুগের সমস্যাগুলো অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এসব সমস্যা চিহ্নিত করে সে আলোকে তা দূর করার চেষ্টা করেছেন। নিম্নে তাঁর তাজদীদী কাজের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো :

---

৬৯. ই.বি. কোষ-১/১৩০

৭০. (সংগ্রামী জীবন-২০, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-১৪/১০

(১) তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শিরক উচ্ছেদ

সেই সময় শিরক একটি ভয়াবহ রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। ইসমাঈলী ও বাতেনী শাসকদের প্রভাব, অমুসলিম ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের সাথে মেলামেশা এবং অজ্ঞ সুফীদের কারণে মুসলিমদের মধ্যে শিরক মিশ্রিত আকীদা বিশ্বাস, চিন্তা ও কর্মের বিস্তৃতি ঘটেছিল। ইয়াহূদী, নাসারা ও পৌত্তলিকদের মতো অনেক মুসলিমও প্রকাশ্যে শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অমুসলিমরা তাদের মহাপুরুষদের কবরে গিয়ে যা কিছু করত অনেক মুসলিম নিজেদের বুযুর্গানে দীনের কবরে গিয়ে তাই করত। তারা কবর বাসীদের কাছে ফরিয়াদ জানাতো, সাহায্য চাইত। তারা মনে করত, যে মহল্লা বা জনপদে কোন বুযুর্গের কবর থাকে তারই বরকতে এলাকাবাসী রিযক পেয়ে থাকে, সাহায্য লাভ করে থাকে এবং দুশমনদের আক্রমণ থেকে সংরক্ষিত থাকে। তারা বিশ্বাস করতে থাকে যে, প্রতিটি শহর ও জনপদে এক একজন করে কুতুব থাকেন। তাদের মধ্যে কেউ শহর কুতুব, কেউ নগর কুতুব, কেউ দেশ কুতুব, আবার কেউ জগত কুতুব। এসব কুতুব মূলত: দেশ ও শহর রক্ষার কাজ করে থাকেন। এ ধরনের আরো অনেক অলীক ও বাতিল বিশ্বাসে তারা বিশ্বাসী ছিল। তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এসব বুযুর্গদের কবরে গিয়ে আবেদন নিবেদন করত, সিজদা করত, সন্তান প্রার্থনা করত, ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল প্রার্থনা করত। এভাবেই সে সমাজে আউলিয়া পূজা, পীর পূজা ও কবর পূজা মহামারি রূপে দেখা দিয়েছিল। ইমাম তাঁর লিখিত : আর রদ্দু আলাল বিকরী (الرد على البكرى) কিতাবে এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তবে অনেক সত্যাশ্রয়ী আলিম ও মুসলিম এর থেকে নিরাপদ ছিলেন।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ) এসবের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। বক্তৃতা, বিবৃতি, ওয়াজ নসিহত এবং লেখনীর মাধ্যমে তিনি এর বিরুদ্ধে পাহাড়ের ন্যায় মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে যান। তিনি তাওহীদ ও শিরক সম্পর্কে অসংখ্য প্রবন্ধ ও বই পুস্তক রচনা করেন। শিরকী আকীদাপুষ্ট লোকদের সাথে বাহাসে বসেন। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। শিরকের মূলোৎপাটনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তাঁর আহ্বান ছিলো : 'তোমরা আল কুরআন ও আস্ সুন্নাহর দিকে ফিরে আস। এর বাইরে রয়েছে ফিসক, বিদআত, শিরক ও কুফর।' তিনি অনেকাংশেই সফল হয়েছিলেন। শিরকের অনেক আড্ডা বিলীন হয়ে গিয়েছিল। আর তিনি রেখে গিয়েছিলেন এক দল বিজ্ঞ আলিম যাঁরা পরবর্তীকালে এ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়েছিলেন। যেমন, আল্লামা হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম, আল্লামা ইবনু কাসীর, আল্লামা ইউসুফ আল মিয্যী প্রমুখ। বস্তুত: ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ) মুশরিকী

আকীদা অপনোদন করে তাওহীদী আকীদা পুন:প্রতিষ্ঠিত করেন। (সংগ্রামী জীবন-৬৮)

(২) সুফীবাদের সংস্কার ও ভ্রান্তি দূরীকরণ

ইমাম ইবনু তাইমিয়ার যুগে সুফীবাদের নামে ভ্রান্ত দর্শনের বেশ প্রভাব ছিল। ইমাম ইবনু তাইমিয়া সুফীবাদ বিশ্লেষণ করে দেখান যে, সুফীবাদ দুইপ্রকার। একপ্রকার সুফী হলো– ধর্মানুরাগী, দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ ও সচ্চরিত্রবান। এরা প্রশংসার যোগ্য। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো– মুশরিক, বিদআতী ও বাতিল। এরা কুরআন সুন্নাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া মতবাদ দিয়ে মানুষকে প্রতারিত করে। আর সাথে সাথে অলীক বিশ্বাস, শিরক ও বিদআতের প্রসার ঘটায়।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে এদের মুখোশ উন্মোচন করে দেন। এদের শিরকী ও বিদআতী কাজগুলো চিহ্নিত করে এর ওপর কঠোর আঘাত হানেন। তিনি এদের মুখোশ উন্মোচন করার লক্ষ্যে কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন। যেমন–

الصوفية والفقراء / الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان القاعدة الجليلة فى التوسل والوسيلة ـ

এ কিতাবগুলো একত্রে "মজমুয়াহে ফাতওয়ায়ে কুবরা" এর ১১নং খণ্ডে তাসাউফ' নামে ছাপানো হয়েছে। অবশ্য সুফীবাদের ভ্রান্তি উন্মোচন করার কারণে সুফীরা তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপে যায় এবং সরকারকে প্রভাবিত করে তাঁকে কারারুদ্ধ করতেও সক্ষম হয়।

(৩) খৃষ্ট মতবাদের মুখোশ উন্মোচন

ইমাম ইবনু তাইমিয়ার সময়ে সিরিয়া ও মিশরে অসংখ্য খৃষ্টান বসবাস করত। তারা বাইতুল মাকদাসকে তাদের নবীর জন্মস্থান হেতু তাদের দেশ হিসেবে দেখতে চাচ্ছিল। তারা এ লক্ষ্যে তাদের দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। তাতারী আক্রমণের কারণে তাদের এ ইচ্ছা আরো প্রবলভাবে প্রকাশ পায়। তারা তাদের প্রচার কাজকে সম্প্রসারিত করতে গিয়ে অসংখ্য বই-পুস্তক রচনা করে বিলি বণ্টন করতে থাকে। এর ফলে অনেক মুসলিমের ঈমান ও আমলের প্রাচীরে ফাটল ধরতে শুরু করে।

ইতোপূর্বে অনেক মুসলিম গবেষক খৃষ্ট ধর্মের সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের অনেকেই খৃষ্ট ধর্মের ইতিহাসের সাথে সঠিকভাবে পরিচিত ছিলেন না।

কিন্তু ইমাম ইবনু তাইমিয়া খৃস্ট ধর্মের ইতিহাস ও এর পরিবর্তন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাই তিনি মুসলিমদের এ ফাটল রোধ কল্পে একদিকে যেমন বক্তৃতা ও বিবৃতির মাধ্যমে খৃস্ট ধর্মের অসারতা প্রমাণ করেন। অন্যদিকে الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح –নামে একখানি তথ্যবহুল পুস্তিকা লিখে খৃস্ট ধর্মের ভ্রান্তি চিহ্নিত করে এর অসারতা প্রমাণ করে মুসলিমদের আকীদার ফাটল দূরীকরণে যথাযথ ভূমিকা ও অবদান রাখেন।[৭১]

(৪) ইসলাম নামধারী বাতিল ফিরকার মুখোশ উন্মোচন

ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাজনৈতিক কারণে যেসব দল বা উপদলের সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে শীয়া, খারেজী, মুরজিয়া ও মুতাযিলা[৭২] প্রধান। এই চারটি মূল ফিতনার উৎস থেকেই পরবর্তীকালের সমস্ত ফিতনার জন্ম। এদের মধ্যে শীয়া সম্প্রদায় কর্তৃক মুসলিম বিশ্ব, মুসলিম জনপদ ও মুসলিম আকীদা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদের কূটকৌশল ও বাতিল আকীদা মুসলিমদের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে। ফলে মুসলিমরা সহীহ আকীদা ও স্বচ্ছ ধারা থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। বিশেষ করে ইমাম ইবনু তাইমিয়ার সময় তাতারী বাদশাহ ওলিজা খুদাবান্দা খানের আশীর্বাদপুষ্ট শীয়া আলিম ইবনুল মোতাহার শিয়াবাদ ও ইমামতের সমর্থনে এবং খিলাফাত ও আহলে সুন্নাতের বিরুদ্ধে "মিনহাজুল কিরামাহ ফি মা'রিফাতিল ইমামাহ" নামে যে বিরাট গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন তা মুসলিমদের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এ গ্রন্থটি আহলে সুন্নাতের উপর প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানে।

এ ধরনের গ্রন্থের জওয়াব লেখা সাধারণ আলিম বা লেখকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ শীয়াদের বাতিল আকীদা, তাদের শিক্ষা হাদীসের রহস্য ও অবান্তর যুক্তির হাকিকাত অনেকের নিকটই অস্পষ্ট ছিল। তবে ইমাম ইবনু তাইমিয়া এমন একজন আলিম ছিলেন যার এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ছিল। তিনি তাঁর ওয়াজ নসিহাত, তাফসীর ও লেখনির মাধ্যমে শীয়াদের মতবাদগুলোর জওয়াব দেন। এছাড়া ইবনুল মোতাহারের গ্রন্থের জওয়াবে ইমাম ইবনু তাইমিয়া একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এর নাম হলো :

(منهاج السنة النبوية فى نقد كلام الشيعة والقدرية)

এ গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি শীয়াদের মুখোশ উন্মোচন করে দেন। এছাড়া অন্যান্য

৭১. (ভূমিকা, ফাতওয়া পৃ. ب)
৭২. (ই.বি. বিশ্বকোষ-১/১৩১

ফিরকাগুলোর আকীদা-বিশ্বাস ও মতবাদগুলোও চিহ্নিত করে রদ করেন। এ বিষয়টি তিনি তাঁর রচিত আকায়েদ, ঈমান ও তাওহীদ সম্পর্কীয় রাসায়েল গুলোতে বিশদ ব্যাখ্যা করেন। হামাবিয়া ও তাদমুরিয়া রিসালাদ্বয়ে তিনি আল্লাহর সিফাত ও গুণাবলী অস্বীকারকারী মু'তাযিলা, জাহমিয়া ও আশায়েরাদের[৭৩] বিরুদ্ধে আঘাত হানেন। এভাবে তিনি বাতিল ফিরকাগুলোর মুখোশ উন্মোচন করে ইসলামী আকীদা সংরক্ষণে অভূতপূর্ণ অবদান রাখেন।"[৭৪]

(৫) দর্শন ও কালাম শাস্ত্রের ভ্রান্তি উন্মোচন

ইমামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারমুলক কাজ ছিল– দর্শন ও কালাম শাস্ত্রের সমালোচনা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরিয়ে দেয়া এবং তার পরিবর্তে কুরআন ও সুন্নাহর যুক্তি গ্রহণ পদ্ধতির প্রচলন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগ থেকে শুরু করে উমাইয়া যুগের শেষ দিন পর্যন্ত মুসলিম মনীষী তথা সাহাবী ও তাবেঈগণ যে কোন সমস্যা সমাধানে সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে দলীল পেশ করতেন। তারা একে দর্শন ও কালাম বা মানতেকের মারপ্যাঁচে আটকে দিতেন না; কিন্তু আব্বাসী খলীফা আবু জা'ফর মানসুরের আমলে যখন গ্রীক দর্শন ও ন্যায় শাস্ত্র আরবীতে অনুবাদের কাজ ব্যাপকভাবে শুরু হয় তখন থেকেই মুসলিম সমাজে গ্রীক দার্শনিকদের চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম দিকে ইসলামী বিশ্বের দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ এরিষ্টটলের চিন্তা ও দর্শনকে চোখ বুঝে স্বীকার করে নেননি। তাঁরা এর সমালোচনায় বই লিখেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মুসলিম বিদগ্ধ সমাজের একটি অংশ গ্রীক দর্শনের ধারকে পরিণত হয়েছিল। তারা গ্রীক দর্শনের অনুবাদ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও প্রসারকে নিজেদের দায়িত্ব বলে মনে করেছিল। মূলত: তারা ছিল এরিষ্টটলের ব্যক্তিত্ব ও দর্শনের পূজারী। এদের মধ্যে দার্শনিক আবু নসর ফারাবী (৩৩৯হি.-৯৫০খৃ.) আবু আলী ইবনে সীনা (৪২৮হি. এবং ইবনে রুশদ (৫৯৫হি.) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ইবনে সিনা তো এরিষ্টটলকে দর্শন শাস্ত্রের একমাত্র সত্যের মাপকাঠি বলে বিশ্বাস করতেন। আর ইবনে রুশদ সম্পর্কে বিখ্যাত লেখক লুতফী জুমুয়া (لطفى جمعة) তাঁর 'তারিখু ফালাসিফাতিল ইসলাম' গ্রন্থে বলেন ইবনে রুশদ যদি একাধিক ইলাহ

৭৩. ই.বি. কোষ / ভূমিকা, ফাতওয়া)। (পৃ. ن-م)
৭৪. ইস. বিশ্বকোষ-১/১৩০

মতবাদের সমর্থক হতেন তাহলে তিনি এরিষ্টটলকে রব্বুল আরবাব (رب الارباب) (সব খোদার বড় খোদা) বলে মেনে নিতেন।[৭৫]

সপ্তম হিজরী শতকে গ্রীক দর্শনের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা ছিল মুসলিমদের মহাশত্রু তাতারী সম্রাট হালাকু খানের বিশ্বস্ত অনুচর মুনাফিক নাসিরুদ্দীন তুসী। তুসীর ছাত্রবৃন্দ এ সময় এবং এর পরবর্তীকালে বিভিন্ন স্থানে অধ্যাপনা ও গ্রন্থ রচনার কাজে হাত দেয়। তাদেরই প্রচেষ্টায় ইরানে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি রচিত হয় যার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে দর্শন ও মানতেক বা ন্যায় শাস্ত্র। নাসিরুদ্দীন তুসী ও তার শাগরিদবৃন্দ এরিষ্টটলকে 'আকলেকুল' 'সমগ্র জ্ঞানময় সত্তা' মনে করতেন এবং তার গবেষণা ও অনুসন্ধানকে চূড়ান্ত আখ্যা দিতেন। ইমাম রাজীর মুকাবিলায় তারা এরিষ্টটলের দর্শন সমর্থন করেন জোরে শোরে। এভাবে তাঁরা এরিষ্টটলের দর্শনকে নবজীবন দান করেন।[৭৬]

ইমাম ইবনু তাইমিয়ার জন্ম হয় নাসিরুদ্দীন তুসীর মৃত্যুর দশ বছর আগে। ইবনু তাইমিয়া যখন জ্ঞান জগতে প্রবেশ করেন তখন চতুর্দিকে দর্শন ও মানতেকের রাজত্ব ছিল। নাসিরুদ্দীন তুসী ও তাঁর শাগরিদরাই ছিলেন এর প্রধান ধারক। মানতেক ও ফালসাফার ভাষাই তখন ছিল ইলমের ভাষা। মানতেক ও ফালাসাফায় যে যত পারদর্শী সেই তত বড় জ্ঞানী ও পণ্ডিত বিবেচিত হতো। মুহাদ্দিস ও ফকীহদের এ ময়দানে কোন গুরুত্ব ছিল না। তাঁরা সবাই প্রায় এ পরিস্থিতিকে মেনে নিয়েছিলেন। দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্র যে ক্ষেত্রে সত্যকে অস্বীকার করে যাচ্ছিল, সেক্ষেত্রে তাঁরা মাথা হেট করে চলাকেই নিজেদের মর্যাদা রক্ষার গ্যারান্টি মনে করেছিলেন। এ অবস্থায় দর্শন ও ন্যায় শাস্ত্রের কঠোর ও নির্ভীক সমালোচনার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। এরিষ্টটলের ব্যক্তিত্ব যে অতি মানবিক নয় এবং তাঁর গবেষণা ও অনুসন্ধান চূড়ান্ত নয় বরং তার মধ্যে ভুল রয়েছে, এ কথা প্রমাণ করার খুব বেশি প্রয়োজন ছিল।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি এ দায়িত্ব এমন সুষ্ঠুভাবে আনজাম দেন যে সাতশো বছর পর সমগ্র ইসলামী দুনিয়ায় আজো এর প্রভাব অক্ষুণ্ন রয়েছে। আজকের পাশ্চাত্য দর্শনের মূলেও রয়েছে এই গ্রীক দর্শন। আর এই গ্রীক দর্শনের ভ্রান্তি উন্মোচন করে দিয়ে তিনি আজকের পাশ্চাত্য দর্শনের

৭৫. ই.বি. কোষ-১/১৩০
৭৬. ই. বি. কোষ-১/১৩০

গলদ নির্দেশের পথও উন্মুক্ত করে গেছেন। এই সঙ্গে কুরআনী যুক্তিবাদিতার সারল্য, হৃদয়গ্রাহিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করার পথও দেখিয়ে গেছেন।[৭৭]

ইমাম ইবনু তাইমিয়া গ্রীক দর্শন, মানতেক খণ্ডন করতে গিয়ে বই লিখেছেন। এ বইয়ের নাম হলো الرد على المنطقيين (আর রদ্দু আলাল মানতিকিয়্যীন)। তিনি এতে মানতেকের ত্রুটি, অসারতা ও বাতুলতা প্রমাণ করেন। এছাড়া নাকযুল মানতিক (نقض المنطق) নামেও একখানা কিতাব লিখেন।

এভাবে ইবনু তাইমিয়া ইসলামের প্রায় প্রতিটি দিক ও বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রতিটি বিভাগে সংস্কারমূলক কাজ আঞ্জাম দেন। আর এটাই ছিল বিরুদ্ধবাদীদের জন্য অসহনীয় ব্যাপার। তাইতো তারা আদাজল খেয়ে নেমেছিল। কিন্তু সত্যের জয় হবেই একদিন– একথাই বাস্তবায়িত হয়েছে। তাঁর সংস্কার আন্দোলন আজও চলছে, ভবিষ্যতেও চলবে ان شاء الله.

ইবনু তাইমিয়ার (রহ) রচনাবলী ও তার প্রভাব

ইবনু তাইমিয়া (রহ) অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এসব রচনার প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। তাঁর উদ্দীপনাময় গ্রন্থগুলোর ফলেই উদ্ভব হয়েছিল ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব (রহ) এর সংস্কার আন্দোলন। মিশরে মুফতী মুহাম্মাদ আবদুহু, ভারতে শাহ ওয়ালি উল্লাহ, মৌলভী আবদুল্লাহ গাযনাবী, নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, মাও: আবুল কালাম আযাদ, মাও: আবদুল কাদির, মিহিরবান ফাখরী মাদরাজী, বাকির আগা মাদরাজী (১২২০হি.), মাও: আবদুল্লাহিল কাফী, মাও: মুহাম্মাদ হামীদ বাঙ্গালী মঙ্গলকোটী প্রমুখ তাঁর রচনাবলীর প্রভাবে সংস্কার প্রচেষ্টা চালান এবং সুন্নাহকে পুন: প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান।[৭৮] পাকিস্তানের সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) তাঁর রচনাবলী দ্বারা খুবই প্রভাবান্বিত হন।

এছাড়া পাক-ভারত উপমহাদেশের সালাফী আন্দোলন ইবনু তাইমিয়ার রচনাবলী দ্বারা খুবই প্রভাবিত।

উলামা সম্প্রদায় তাঁর ৬০০০ ভলিউম রচনার কথা উল্লেখ করেছেন।[৭৯] ইবনু

---

৭৭. ই.বি. কোষ-১/১৩০
৭৮. ই.বি. কোষ-১/১৩০
৭৯. ই.বি.কোষ-১/১২৯

তাইমিয়া (রহ) পাঁচ শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে উল্লেখ আছে।[৮০] এসব গ্রন্থের মধ্যে মাত্র ১৫৯ টির অস্তিত্ব বজায় আছে। বাকী গ্রন্থগুলোর শুধু নাম জানা যায়। এসবের মধ্যে ইবনু আবদিল হাদী, নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান এবং গুলাম জিলানী করক ৪৮০ খানা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু তাইমিয়া (রহ) এর গ্রন্থাবলীর মধ্যে কয়েকটি হল :

১। মাজমুআতুর রাসাইলিল কুবরা (مجموعة الرسائل الكبرى) ২৮টি নিবন্ধের সমষ্টি ২ খণ্ডে পৃ. ৮৭৫ কায়রো ১৩২৩ হিজরী।

২। মাজমুআতুর রাসাইল (مجموعة الرسائل) ৯টি নিবন্ধের সমষ্টি (পৃ. ২২২) কায়রো ১৩২৩ হিজরী।

৩। মাজমুআতুর রাসাইল ওয়াল মাসাইল (مجموعة الرسائل والمسائل) ২১টি নিবন্ধের সমষ্টি ৫খণ্ডে সমাপ্ত পৃ. ৮৮৬ কায়রো ১৩৪১-৪৯ হি.।

৪। আস সারিমুল মাসলুল আলা শাতিমির রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم) পৃ. ৫৯২ হায়দারাবাদ দাক্ষিণাত্য ১৩২২ হিজরী।

৫। আল কায়েদাতুল জালীলাহ ফিত তাওয়াসসুল ওয়াল ওয়াসীলাহ (القاعدة الجليلة فى التوسل والوسيلة) ১৫৫ পৃ. কায়রো-১৩৪৫ হি.।

৬। আল জওয়াবুস সহীহ লিমান বাদ্দালা দীনিল মাসীহ (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) ৪ খণ্ডে কায়রো-১৩২২ হিজরী।

৭। কিতাবু মিন হাজিস সুন্নাতিন নাবাবিয়াহ ফী নাকদি কালামিশ শীয়াতে ওয়াল কুদরিয়া (كتاب منهاج السنة النبوية فى نقد كلام الشيعة والقدرية) ৪ খণ্ডে পৃ. ১১৫৫ বুলাক ১৩২১-২২ হিজরী।

৮। মুওয়াফিকাতুস সারীহ আল মা'কূল লিসসাহীহুল মানকূল (موافقة الصريح المعقول للصحيح المنقول) উপরোক্ত মিনহাজুস সুন্নাহর হাশিয়াতে মুদ্রিত)।

৯। রিসালাতুল ইজতিমা ওয়াল ইফতিরাক ফিল হালাফ বিত তালাক (رسالة الاجتماع والافتراق فى الحلف بالطلاق)।

---

৮০. ই.বি.কোষ/১১২৯

১০। তাফসীরু সূরাতিল ইখলাস (تفسير سورة الاخلاص) কায়রো ১৩২৩ হিজরী।

১১। তাফসীরু সূরাতিন নূর (تفسير سورة النور) কায়রো-১৩৪৩ হিজরী, পৃ.-১২৬।

১২। আল কিয়াস ফি শরঈল ইসলাম القياس فى شرع الاسلام ফখুস লিইবানে কায়্যিমসহ কায়রো, ১৩৪৬ হি.।

১৩। আরবাউনা হাদীসা (কায়রো ১৩৪১) اربعون حديثا।

১৪। رسالة الملك المؤيد ابى الفداء اسماعيل (পাণ্ডুলিপি ইণ্ডিয়া)।

১৫। القاعدة المراكشية لابن تيميته পাণ্ডুলিপি পশ্চিম জার্মানী যুবিঈন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাকার।

১৬। سوال لابن تيمية (ঐ) (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ)।

১৭। مجموعة الفتاوى الكبرى (৩৭ খণ্ডে সমাপ্ত)।

১৮। তাদমুরিয়া (التدمورية)।

১৯। আল ওয়াসেতিয়া (الواسطيه)।

২০। আল হামাবিয়্যা (الحموية)।

২১। আল মাদানিয়া (المدنية)।

২২। রা'সুল হুসাইন (راس الحسين)।

২৩। السياسة الشرعية (আস সিয়াসাতুশ শারয়িয়্যা)।

২৪। আল জাওয়াবুল বাহের (الجواب الباهر)।

২৫। তাফসীর সূরাতি সাব্‌বাহা (تفسير سورة سَبِّح)।

২৬। আল কাওয়ায়েদুন নুরানিয়া (القواعد النورانية)।

২৭। নজরিয়াতুল আকদ (نظرية العقد)।

২৮। মাজমু ইবনে রুমাইহ (مجموع ابن رميح)।

২৯। নাকদুল মানতিক (نقض المنطق)।

৩০। মুখতাসারু নাসিহাতিল ইখওয়ান আন মানতিক ইউনান (مختصر نصيحة الاخوان عن منطق اليونان)।
৩১। আল মারদীনিয়াত (المردينيات)।
৩২। কিতাবুল ঈমান (كتاب الايمان)।
৩৩। শরহু হাদীসে আবী যার (شرح حديث ابى ذر)।
৩৪। শরহু হাদীসিন নুযুল (شرح حديث النزول)।
৩৫। বায়ানুল হুদা মিনাদ দালাল ফি আমরিল হিলাল (بيان الهدى من الضلال فى امر الهلال)।
৩৬। আল ফাতাওয়াল মিসরিয়া (الفتاوى المصرية)।
৩৭। মানাসিকুল হজ্জ (مناسك الحج)।
৩৮। বা'দু শাজারাতিল বালাতীন (بعض شذرات البلاتين)।
৩৯। আল ফুরকান বাইনা আওলিয়ায়ের রহমান ও আওলিয়ায়িশ শয়তান (الفرقات بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان)।
৪০। জাওয়াবু আহলিল ইলম ওয়াল ঈমান (جواب اهل العلم والايمان)।
৪১। মিন ফাতাওয়া শাইখিল ইসলাম (من فتاوى شيخ الاسلام)।
৪২। আত তোহফাতুল ইরাকিয়া (التحفة العراقية)।
৪৩। মুকাদ্দিমাতুত তাফসীর (مقدمة التفسير)।
৪৪। আস সুফিয়া ওয়াল ফুকারা (الصوفية والفقراء)।
৪৫। তাফদীলু মাজহাব আহলিল মদীনা (تفضيل مذهب اهل المدينة)।
৪৬। আল কুবরু সিয়া (القبرصية)।
৪৭। কাসীদাতুল কাদর (قصيدة القدر)।
৪৮। নাকদু মারাতিবিল ইজমা (نقد مراتب الاجماع)।
৪৯। আল আফয়ালুল ইখতিবারিয়া (ভূমিকা, ফাতওয়া) (الأفعال الاختيارية)।
৫০। কিতাবুর রদ আলাল মানতিকিয়ীন (كتاب الرد على المنطقيين) ইত্যাদি।

ইবনু তাইমিয়ার (রহ) পক্ষে-বিপক্ষে

❖ ইবনু তাইমিয়ার (রহ) ব্যাপারে মুসলিম পণ্ডিতগণ দু'ভাগে বিভক্ত। তাঁর বিরোধীদের মধ্যে ছিলেন ইবনে বতুতা, ইবনে হাজার আল হায়তামী, তাকী উদ্দীন আস-সুকুকী ও তৎপুত্র আব্দুল ওয়াহ্হাব, ইযযুদ্দীন ইবনে জাময়া, আবু হাইয়ান আজ জাহেরী আল আন্দালুসী প্রমুখ।

❖ তবে ইবনু তাইমিয়ার বিরোধীদের চেয়ে তাঁর প্রশংসাকারীদের সংখ্যাই অধিক। এঁদের মধ্যে ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযীয়া, আযযাহাবী, ইবনু কুদামা, ইবনু কাসীর, আস সারসারী আস সুফী, ইবনুল ওয়ারদী, ইবরাহীম আল কুরানী, মোল্লা আলী আলকারী, আল হারাবী, মাহমুদ আল আলুসী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। কেউ কেউ এমন মন্তব্য করেছেন যে, ইবনু তাইমিয়ার ইসলামী চেতনা রাজনৈতিক সমস্যার কারণে কোথাও কখনও বিচ্যুত হতে পারেনি।

❖ কেউ কেউ তাঁকে শাইখুল ইসলাম নামে অভিহিত করার বিপক্ষে কঠোর মন্তব্য করেছেন। এর প্রতিবাদে শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আবী-বাকর (৮৪২) "আর রাদদুল ওয়াফির" (الرد الوافر) নামে গ্রন্থ রচনা করে এর জওয়াব দিয়েছেন।

❖ ইবনে হাজার আল হায়তামীর সমালোচনার জওয়াবে মাহমুদ আল আলুসী (মৃত. ১৩১৭ হি.) "জালাউন আইনায়ন" গ্রন্থ লেখেন (جلاء العينين)।

❖ ইউসুফ আন নাবহানী তাঁর শাওয়াহিদ আল হাক্কা ফিল ইস্তিগাছাহ বি সায়্যিদিল খালক (الشواهد الحقة فى الاستغاثة بسيد الخلق) গ্রন্থে তাঁকে কঠোরভাবে আক্রমণ করেন। অপর দিকে আবুল মা আলী আশ শাফিঈ আস সালামী তাঁর গায়াতুল আমানী ফির রাদ্দে আলান নাবহানী (غاية الامانى فى الرد على النبهانى) গ্রন্থে (কায়রো ১৩২৫)-এর জওয়াব দেন।

❖ এতদ্ব্যতীত মুহাম্মাদ সাঈদ মাদরাজী ইবনু তাইমিয়ার বিপক্ষে আততানবীহ বিত তানযীহ (التنبيه بالتنزيه) নামে একখানি পুস্তক লিখেন। (হায়দারাবাদ ১৩০৯ হি.)। তদুত্তরে আল্লামা আহমাদ ইবনে ইবরাহীম আন নাজদী একটি পুস্তিকা রচনা করেন। (মিশর ১৩২৯ হি.)[৮১]

---

৮১. ই.বি.কোষ, তাজকিরাহ-১৪/১৪৯৭; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-১৪/১৩৫

বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি

আল্লামা ইবনু তাইমিয়া সম্পর্কে এতসব সমালোচনা সত্ত্বেও এ কথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে তাঁর বিরুদ্ধবাদী সমালোচকরা তাঁর পাণ্ডিত্য স্বীকার করতেন। যেমন-

❖ বিরুদ্ধবাদী আল্লামা কামালুদ্দীন আয যামানকানী (মৃ. ৭২৭ হি.) বলেন, ইবনু তাইমিয়া হলেন আল্লাহর সর্বজয়ী (هو حجة الله القاهرة)। তিনি হলেন সমকালীন প্রতিভা।

❖ আবু হাইয়্যানও (মৃ. ৭০২ হি.) তাঁর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি বলেন, ইবনু তাইমিয়া জ্ঞানের এমন এক সমুদ্র যার তরঙ্গগুলো মুক্তা বিচ্ছুরিত করতে থাকে।

❖ ইবনে বতুতা তাঁর মহত্ত্বে এতো প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন যে বহু বছর ভ্রমণ করে যখন তিনি জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁর মনে ইবনু তাইমিয়ার মহত্ত্বের প্রভাব সুস্পষ্ট ছিল। তিনি লিখেছেন, ইবনু তাইমিয়া ছিলেন সিরিয়ার একজন প্রধান ব্যক্তি। তিনি সকল বিষয়ের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারতেন। দামিশকবাসীরা তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত।

কোন সমস্যার সমাধানে ইবনু তাইমিয়ার (রহ) অনুসৃত নীতি

যে কোন সমস্যার সমাধানে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে আল্লামা ইবনু তাইমিয়ার (রহ) নিয়ম এই ছিল যে, তিনি সর্ব প্রথম আল কুরআন থেকে প্রমাণ উপস্থিত করতেন। আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতগুলো একত্র করে এসবের ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গির আলোকে সমাধান খুঁজতেন। তিনি হাদীসের রাবীদের যাচাই-বাছাই করতেন এবং রিওয়ায়াত হিসেবে এর বিশ্বস্ততা ও অবিশ্বস্ততা পরীক্ষা করতেন, এরপর তিনি সাহাবীদের কর্মপন্থা, চারজন ফকীহ এবং অন্যান্য বিখ্যাত ইমামদের মতও আলোচনা করতেন এবং এই দৃষ্টি ভঙ্গিতেই তিনি তৎকালীন প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে যাচাই করেছেন।

ইবনু তাইমিয়ার (রহ) প্রতি অবিচার

আল্লামা ইবনু তাইমিয়া (রহ)-এর জীবন-যাপন, ধর্মানুরাগ, কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে বিস্ময়কর জ্ঞান ও প্রতিভা, বাতিলদের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী, জবানী যুদ্ধ, শিরক বিদআতের বিরুদ্ধে তাঁর কঠোর অবস্থান, পদলেহী আলিম নামধারীদের পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে অবান্তর ফাতওয়া, বিদআতপন্থী শাসক কর্তৃক জেল যুলম, সর্বোপরি তাতারীদের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধে জয়লাভ ইত্যাদি এ কথাই প্রমাণ করে যে তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ দীন দরদী আল্লাহর পথের সৈনিক ও মহান

মুজাদ্দিদ। তাঁর সংস্কারমূলক কাজগুলোর কারণে বিদআতীরা প্রমাদ গুনে তাঁর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। তাঁর কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক সঠিক মতবাদগুলোকে বিদআতীরা বিকৃত করে আওয়াম ও সরকারকে ধোঁকা দিয়েছিল, এমনকি তাঁকে বাতিলপন্থী বলতেও দ্বিধাবোধ করেনি। যেসব আকীদা ও মতবাদের কারণে তাঁর বিরুদ্ধে অপ্রপ্রচার চালানো হয়েছিল, আমরা নিম্নে এর ২/৪টি উল্লেখ করছি। এতে বিদআতী শিরকপন্থী ও কবর পূজারীদের মুখোশ উন্মোচিত হবে। ইনশাআল্লাহ।

তাঁর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগ হল :

(১) ইবনু তাইমিয়ার মতে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোন উসীলা গ্রহণ করা শিরক।

(২) ওলীগণের কবর যিয়ারাত এমনকি রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবর যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে সফর করা ইবনু তাইমিয়ার মতে নাজায়েয।

(৩) তাঁর মতে সাহাবায়ে কিরাম তানকীদ বা সমালোচনার উর্ধ্বে নন।

(৪) ইবনু তাইমিয়ার মতে আম্বিয়ায়ে কিরাম মাসুম বা বেগুনাহ নন।

(৫) আল্লাহ্ তা'আলা নিরাকার ও অসীম নন বরং সাকার ও সসীম।

(৬) ইবনু তাইমিয়া গাওস, কুতুব ও আবদালের এনকার করেন এবং সুফীদের সম্পর্কে অশোভন উক্তি করেন।

(৭) ইবনু তাইমিয়া হযরত উমার (রা) এবং আলীর (রা) প্রতিও দোষারোপ করেছেন। তিনি হযরত উমার (রা) সম্পর্কে বলেছেন যে তিনি বহু ভুল-ভ্রান্তি করেছেন এবং হযরত আলী (রা) সম্বন্ধে বলেছেন যে তিনি তিন শতাধিক ভুল-ভ্রান্তি করেছেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

অভিযোগের জওয়াব

আল্লামা ইবনু তাইমিয়া থেকে যদি এসব আকীদা বা উক্তি প্রকাশ পেয়ে থাকে তাহলে তা অবশ্যই চিন্তার বিষয় এবং ইসলামের জন্য খুবই মারাত্মক। আর যদি এ অভিযোগগুলো মিথ্যা, অবান্তর প্রমাণিত হয় তাহলে যারা এ অভিযোগ করেছেন তাদের ঈমানই তো প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। আমরা এ সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা করছি।

১। প্রথম কথা হলো : যারা এ অভিযোগগুলো করেছেন তাঁরা তা ফাতওয়া আকারেই তাঁর বিরুদ্ধে আরোপ করেছেন। তাঁরা তাঁর কোন কিতাব বা গ্রন্থের

রেফারেন্স পেশ করেননি। এতে প্রমাণিত হয় যে এটা হিংসা বিদ্বেষ প্রসূত বা সত্যকে গোপন করার অপচেষ্টা মাত্র।

২। দ্বিতীয় কথা হল : আমাদের দেশে যাঁরা এরূপ অভিযোগ প্রচার করেছেন তাঁরাও কিন্তু তাঁর কোন রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেননি বরং ইবনু তাইমিয়ার শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে যে সব বই লিখেছেন তাঁর থেকেই উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এটাকে কি 'ইলমী আমানত' বলা যায়? কখনও নয়।

৩। তৃতীয় কথা হলো : এসব অভিযোগের প্রায় সবগুলোই হল মিথ্যা, অবান্তর, হঠকারিতামূলক, অর্থ বিকৃতি, সত্য গোপনের মহা চক্রান্ত এবং শিরক ও বিদয়াত টিকিয়ে রাখার ব্যর্থ প্রয়াস।

অভিযোগগুলোর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

১। আল্লামা ইবনু তাইমিয়া (রহ) কখনও সাহাবীদের দোষারোপ করা জায়েয মনে করতেন না। বরং তা হারাম ও কুফরী মনে করতেন। তাঁর লিখিত "মিনহাজুস সুন্নাহ" গ্রন্থ তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

২। হযরত উমার (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর ব্যাপারে যে অভিযোগ এসেছে তা নিতান্তই অবান্তর ও আষাঢ়ে গল্প। এর কোন ভিত্তি নেই। এ ব্যাপারে ইসলামী বিশ্বকোষের ভাষ্য নিম্নরূপ : (কথিত আছে যে, আস সালেহিয়াত আল জাবাল মসজিদের মিম্বার থেকে তিনি ঘোষণা করেন যে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) অনেকগুলো ভুল করেন। আল্লামা তুসী লিখেছেন যে "পরে ইবনু তাইমিয়া তাঁর এ উক্তির জন্য অনুতাপ করেন"। অথচ মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থে তিনি উমার (রা) এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

তাঁর আর একটি উক্তি এই যে আলী ইবনু আবী তালিব (রা) ৩০০টি ভুল করেন (আদ দুবারুল কামিনা ১ম খণ্ড-৯৫৪। এই গ্রন্থে ১৭টি ভুলের কথা উল্লেখ আছে)[৮২] ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণেতাগণ লিখেন : প্রকৃতপক্ষে ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ) সাহাবীদের (রা) প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু তাঁদেরকে সকল ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে মনে করতেন না। যেমন উগ্রপন্থি শীয়ারা আলী (রা) সম্বন্ধে এই ধারণা পোষণ করে থাকে। বস্তুত: "জাবাল কাসরাওয়ান" এর এক চরম পন্থী শীয়া হযরত আলী (রা)-এর নিষ্পাপ হওয়া সম্পর্কে তাঁর সাথে তর্কে প্রবৃত্ত হন। ইবনু তাইমিয়া (রহ) ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন পূর্বক প্রমাণ করেন যে, আবদুল্লাহ

৮২. বিশ্ব কোষ, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-১৪/১৩৫ তাজকিরাহ-৪/১৪৯৭

ইবনে মাসউদ (রা) ও আলী (রা) এর মধ্যে কতকগুলো প্রশ্নে মতভেদ দেখা দিলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইবনু মাসউদের (রা) পক্ষেই রায় দেন। (এই কাসরাওয়ানীদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের সৈন্য প্রেরণ করতে হয়। এরা মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মোঙ্গলদেরকে কয়েকবার সাহায্য করেছিল। এরা প্রথম তিন খলীফা ও ইসলামের বহু ধর্মীয় নেতাকে কাফির বলে জানত) বস্তুত: হযরত আলী (রা)-এর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা ইবনু তাইমিয়ার উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল, শুধু নবীরাই নিষ্পাপ (মাসুম)। বস্তুত তিনি সাহাবীদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এবং তাঁদের উন্নত ও মহান মর্যাদা স্বীকার করতেন। ইবনে তাইমিয়া তাঁর আল আকীদাতুল হামাবিয়া" গ্রন্থে লিখেছেন "মুতাকাল্লিমদের ধারণা এই যে, সাহাবা (রা) এবং তাবেঈগণ সরল বিশ্বাসী ছিলেন এবং বিশ্বাসমূলক মৌলিক আয়াতগুলো সমন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করার যোগ্যতাও তাঁদের ছিল না। এই ধারণা নিরেট মূর্খতার পরিণাম। হায়! যদি এই সব জ্ঞানান্ধরা (মুতাকাল্লিমরা) জানতো যে সাহাবা ও তাবেঈগণ সন্দেহ ও অনুমানের অন্ধকার হতে বের হয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ও বিশ্বাসের আলোকোদ্ভাসিত জগতে পৌছেছেন, তাঁদের পথে সন্দেহের কন্টক ছিল না, অনুমানের ঝোঁপঝাড় ছিল না, মানতিক ও দর্শনের গোলক ধাঁধাও ছিল না। তাঁদেরকে স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্যের ব্যাপারে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁদের সম্মুখে অতীত ও ভবিষ্যতের বাস্তবতা উদঘাটিত হয়েছিল। তাঁরা কুফর ও অবাধ্যতার অন্ধকারের মধ্যে সূর্যের ন্যায় আলোকোজ্জল ছিলেন। তাঁরা শুধু আল্লাহর গ্রন্থটি হস্তে ধারণ করে পূর্ব ও পশ্চিম দেশগুলোর সম্মুখে উৎকৃষ্টতম কর্মের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। আল্লাহর গ্রন্থ তাঁদের সাথে কথা বলত। আর তাঁদের জ্ঞানবুদ্ধি বানু ইসরাঈলের নবীদের জ্ঞান অপেক্ষা কম ছিল না... তাঁদের দৃষ্টির প্রসারতা, চিন্তার অগ্রগতি এবং বিস্ময়কর অনুধাবন শক্তি মাপবার কোন মানদণ্ড নেই।"[৮৩]

২। আল্লামা ইবনু তাইমিয়ার (রহ) বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ হলো, তিনি আল্লাহ তা'আলাকে নিরাকার ও অসীম মনে করেন না। এ অভিযোগটি একেবারেই অবান্তর ও মিথ্যা। তিনি কোথাও বলেননি যে আল্লাহ সাকার ও সসীম বা তিনি নিরাকার ও অসীম নন, এটা কেউ দেখাতে পারবে না। আসল কথা হল আল্লাহ তা'আলা কি নিরাকার না সাকার তিনি কি অসীম না সসীম এ ব্যাপারে তিনি কোন কথা না বলে বরং আল্লাহ তা'আলার গুণ ও নাম ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এসব বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে,

৮৩. ই.বি.কোষ, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-১৪/১৩৫-১৩৬

আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার জন্য যেসব নাম, গুণ বা অঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলোকে কোনরূপ বিকৃতি ছাড়াই বিশ্বাস করতে হবে। এগুলোর কোন আকৃতি বা ধরন কিছুই উল্লেখ করা যাবে না বরং বিশ্বাস করতে হবে যে এসব নাম, গুণ ও অঙ্গগুলো আল্লাহর জন্য রয়েছে, তবে এর ধরন বা আকৃতি আমরা জানি না বরং এগুলো আল্লাহ তা'আলার জন্য যেরূপ শোভনীয় সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। এ হলো তাঁর আকীদা। এ আকীদাই হলো হাক্কানী উলামায়ে কিরামের অভিমত। ইমাম আবু হানিফাসহ চার ইমাম এ আকীদা পোষণ করতেন। এ আকীদাকেই কেউ কেউ অজ্ঞতার কারণে মানবীয় গুণাবলী বা সাকার বলে চালিয়ে দিয়েছেন।

৩। আল্লামা ইবনু তাইমিয়ার (রহ) প্রতি তৃতীয় অভিযোগ হলো তিনি আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোন ধরনের উসীলাকে শিরক মনে করেন।।

আসলে এ অভিযোগটি ডাহা মিথ্যা ও অবান্তর। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য ঈমান, নেক আমল অবশ্যই উসীলা। এসব উসীলা ব্যতীত পরকালীন মুক্তি বা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার কোনই সুযোগ নেই। এই উসীলাকে অস্বীকার করা বা শিরক বলার মত কোন ধৃষ্টতা কেউ দেখাতে পারে কি? আল্লামা ইবনু তাইমিয়া (রহ) এসব উসীলাকে শিরক বলেছেন বলে কোন প্রমাণ কেউ দেখাতে পারবে কি? কখনো পারবে না। তাহলে ঐ রকম মিথ্যা ফাতওয়া বা অবান্তর অভিযোগ করার কারণটা কি?

তবে হাঁ আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করার সময় কোন ব্যক্তি বা বস্তুর উসীলা দেবেন কিনা এ ব্যাপারে তিনি বেশ কিছু কথা বলেছেন। তিনি তাঁর কিতাব 'আল কায়েদাতুল জালীলাই ফিত তাওয়াচ্ছুলে ওয়াল উসীলায়' القاعدة الجليلة فى التوسل الوسيلة। উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ প্রার্থনা করার সময় চার ধরনের উসীলা পেশ করার রীতি দেখা যায়–

১। ঈমানের উসীলা দিয়ে দু'আ করা।

এটা কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ও সুন্নাত। এটা অতীব সুন্দর ও ভাল। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, (সূরা আলে ইমরান : ১৯৩)

رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا.

رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ -

এ আয়াতে ঈমানের উসীলা দিয়ে মুমিন বান্দারা আল্লাহর নিকট অন্যায় ও

অপরাধের ক্ষমা ও নেককার লোকদের সাথে ওফাত লাভ করার প্রার্থনা করেছেন।[৮৪]

২। দ্বিতীয় প্রকার উসীলা হল নেক আমলের উসীলা।

যেমন তিনজন গুহাবাসীর ঘটনা। সহীহ্ আল বুখারীতে ও সহীহ্ মুসলিমে উল্লেখ আছে যে পূর্বের উম্মাতের তিন ব্যক্তি একটি গুহায় আটকে পড়েছিল। তারা নেক আমলের উসীলা দিয়ে দু'আ করে সেখান থেকে মুক্তি পেয়েছিল।[৮৫]

৩। তৃতীয় প্রকার উসীলা হলো : কোন নেককার ব্যক্তির নিকট গিয়ে তাঁর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দু'আ করানো।

যেমন, সাহাবা কিরাম (রা) বিভিন্ন সময় রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে তাঁকে দু'আ করতে অনুরোধ করতেন। হযরত আব্বাস (রা) দ্বারা হযরত উমার (রা) বৃষ্টির জন্য দু'আ করিয়ে ছিলেন।[৮৬] সাহাবায়ে কিরাম জুম'আর নামাযের সময় (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে অনাবৃষ্টির কারণে দু'আ চেয়েছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'আ করেছিলেন। আবার পরের জুম'আয় অতিবৃষ্টির কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে দু'আ চেয়েছিলেন। তিনি দু'আ করেছিলেন। এ রকম অনেক হাদীস সহীহ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে উল্লেখ আছে। ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ) তাঁর রচিত উল্লেখিত কিতাবে উপরোল্লেখিত তিন প্রকার উসীলাকে উত্তম ও সুন্নাত বলে উল্লেখ করেছেন। এরপরও তাঁকে উসীলা অস্বীকারকারী বানানো জঘন্য অন্যায় নয় কি?

৪। চতুর্থ প্রকার উসীলা হল : কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাঁর ব্যক্তিত্বের উসীলা দিয়ে বা দোহাই দিয়ে আল্লাহর নিকট দু'আ করা।

যেমন এরূপ বলা যে, হে আল্লাহ, আপনার অমুক বান্দার উসীলায় বা অমুক বান্দার কারণে বা অমুক বান্দার মাধ্যমে আমাকে ক্ষমা করে দিন বা আমাকে অমুক জিনিস দিন ইত্যাদি।

বস্তুত, আমাদের সমাজে এই রকম উসীলাই উসীলা নামে প্রচলিত আছে। পূর্বে উল্লেখিত তিন প্রকার উত্তম উসীলা কিন্তু আমাদের সমাজে উসীলা নামে তেমন প্রসিদ্ধ নয়। বরং উসীলা বললেই তাদের মন চলে যায় চতুর্থ প্রকার উসীলার

৮৪. ই.বি.কোষ-১/১২৮

৮৫. ইবনু রাজব/ই.বি.কোষ-১/১২৮

৮৬. ই.বি.কোষ-১/১২৮

দিকে। এ কারণেই ইবনু তাইমিয়া যখন চতুর্থ প্রকারকে অবৈধ বলে ফতোয়া দেন তখন বিরুদ্ধবাদীরা তাকে উসীলা অস্বীকারকারী সাব্যস্ত করে ফেলেন।

আল্লামা ইবনু তাইমিয়া (রহ) প্রথম তিন প্রকার উসীলাকে উত্তম ও সুন্নাত বা জায়েয মনে করেন। কারণ এগুলো কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর চতুর্থ প্রকার উসীলাকে তিনি অবৈধ ও নাজায়েয মনে করেন। কারণ এর সপক্ষে কুরআন বা সহীহ হাদীস বিদ্যমান নেই।

চতুর্থ প্রকার সম্পর্কে যা কিছু বলা হচ্ছে তা মিথ্যা বা নিতান্ত দুর্বল হাদীস অথবা সহীহ হাদীসের অর্থ বিকৃতি। তার পরেও কথা হলো চার প্রকার উসীলার মধ্যে তিন প্রকার তথা ৪এর ৩ ভাগ মানার পর তাঁকে উসীলা অস্বীকারকারী বলার উপায় আছে কি? তবে যারা শুধু চতুর্থ প্রকারকেই উসীলা মনে করে, অবশিষ্ট তিন প্রকারকে নয়, তাদেরকেই উসীলা অস্বীকারকারী বলা উচিত, কারণ তারা তিন ভাগকেই অস্বীকার করে।

(৪) তাঁর প্রতি চতুর্থ অভিযোগ হল তিনি কবর যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে সফর করাকে হারাম বা অবৈধ মনে করেন। এর জওয়াব এই যে, ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ) কবর যিয়ারাতকে সুন্নাত মনে করেন। তিনি কবর যিয়ারাতকে অবৈধ মনে করেন না। তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الاقصى (متفق عليه)

'মসজিদে হারাম, আমার এই মসজিদ এবং মসজিদে আকসা– এই তিন মসজিদ ব্যতীত সফর করা যাবে না'।

এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইমাম ইবনু তাইমিয়া কবর যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে সফর করা অবৈধ মনে করেন। এটা শুধু তাঁরই মত নয় বরং তাঁর পূর্বের এবং পরের অসংখ্য মুহাক্কিক আলিম ও মুহাদ্দিস এই মত পোষণ করেন। উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সহীহ আল বুখারীর টীকা লেখক শাইখ আহমাদ আলী সাহারানপুরী (রহ) এ ব্যাপারে উলামা সম্প্রদায়ের মতভেদ উল্লেখ করেছেন। আর তাঁর কথার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে তিনি অবৈধ হবার পক্ষেই রায় দিচ্ছেন। অন্যদিকে যারা কবর যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে সফর করাকে বৈধ মনে করছেন তাঁদের নিকট সহীহ কোন প্রমাণ মওজুদ নেই। তাঁরা কিছু দুর্বল ও জাল হাদীস দিয়ে প্রমাণ পেশ করছেন যাতে আবার সফর করার কথাও উল্লেখ নেই।

অতএব ইমাম ইবনু তাইমিয়ার (রহ) প্রতি বাতিল আকীদার অভিযোগ উথাপন করা অবান্তর ও বানোয়াট।

(৫) নবীদের মাসুম না হওয়া বা সাহাবীদের সমালোচনা করার অভিযোগ ভিত্তিহীন ও মনগড়া। এর চেয়ে বেশি জওয়াব দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

(৬) সুফীদের ব্যাপারে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা যথার্থ। কারণ যাঁদের ব্যাপারে তিনি মন্তব্য করেছেন তাঁদের অনেকেই ছিলেন বিদআতী ও শিরকে লিপ্ত। এছাড়া শহর গাউস বা শহর আবদাল ইত্যাদি সম্পর্কে যে বিশেষ কথা এসেছে তা কোন সহীহ হাদীসে নেই। তাই তা মান্য করারও কোন প্রয়োজন পড়ে না।

ওফাত, জানাযা ও দাফন

আল্লামা ইবনু তাইমিয়া (রহ) ৭২৮ হিজরী সনের ২০ জুলকাদা (মুতাবিক ১৩২৮ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রোববার দিবাগত রাতে দামিশকের দুর্গে অন্তরীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তৎকালীন মুহাদ্দিসদের ইমাম শায়খ ইউসুফ আলমিয্যী প্রমুখ তাঁর শেষ গোসলের ব্যবস্থা করেন এবং তাঁকে তাঁর ভাই ইমাম শরফুদ্দীন আবদুল্লাহর (মৃ. ৭২৭ হি.) পার্শ্বে সুফীদের কবরস্থানে দাফন করা হয়।

তাঁর মৃত্যুর দিন দামিশকের সব দোকান পাট বন্ধ হয়ে যায়। দামিশকের অধিবাসীরা তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। তাঁরা মহা আড়ম্বরে তাঁর জানাযা ও দাফন সম্পন্ন করেন। প্রায় দুই লক্ষ পুরুষ এবং পনর হাজার নারী তাঁর সালাতে জানাযায় যোগদান করেন।

তাঁর জানাযার সালাত চারটি স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম জানাযা দুর্গের মধ্যে, দ্বিতীয় জানাযা দামিশকের বানু উমাইয়া জামে মসজিদে, তৃতীয় জানাযা শহরের বাইরে এক বিশাল ময়দানে এবং চতুর্থ জানাযা সুফীদের কবরস্থানে। কিন্তু শেষোক্ত জানাযায় শুধুমাত্র কয়েকজন রাজকর্মচারী শরীক হয়েছিলেন বিধায় কোন কোন জীবনী গ্রন্থে এ জানাযার কোন উল্লেখ নেই।

আল্লামা বাযযায বলেন, আমরা এমন কোন শহরের কথা জানি না, যেখানে তাকিউদ্দীন ইবনু তাইমিয়ার মৃত্যুর সংবাদ পৌছেছে অথচ লোকেরা গায়েবানা জানাযার সালাত আদায় করেনি।

চীনের মতো দূরবর্তী দেশেও তাঁর গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

বর্তমানে দামিশকের সুফী কবরস্থানের কবরগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে, কিন্তু ইবনু তাইমিয়ার কবরটি এখনো সুরক্ষিত আছে।

ইবনুল ওয়ারদী (৭৪৯ হি.) এবং আরো অনেকে তাঁর শোকগাথা রচনা করেছেন। আল্লামা ইবনু কাসীর (৭৭৪) এসব মনীষীদের নাম তাঁর আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। এদের মধ্যে ইমাম আয যাহাবী, ইবনু ফাদলিল্লাহ আল উমারী, মাহমুদ ইবনু আসীর, কাসিম আল মুকরী প্রমুখ রয়েছেন।

সমসাময়িক বিশিষ্ট উলামায়ে কিরাম

আল্লামা ইবনু তাইমিয়ার (রহ) সময়টা ছিল বিশ্ব বিখ্যাত উলামা সম্প্রদায়ের যুগ। নিম্নে তাঁর সমসাময়িক কয়েকজন আলিমের নাম উল্লেখ করা হলো–

১। মুসনাদুন ইসকান্দারিয়া শাইখ ইমাম আবু ইসহাক ইযযুদ্দীন ইবরাহীম ইবনে আহমাদ ইবনে আবদুল মুহসিন আল হুসাইনী আল গুরাফী, মৃ. ৭২৮ হি:।

২। মুসনাদুল ইরাক শাইখুল মুসতানসারিয়া আফীফুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল মুহসিন আল আযজী আল হাম্বলী ইবনুল দাওয়ালেবী, মৃ ৭২৮ হি:।

৩। প্রধান বিচারপতি শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু উসমান ইবনুল হারীরী, মৃ. ৭২৮ হি:।

৪। কাযী জামালুদ্দীন ইউসুফ ইবনু মুজাফফর ইবনু আহমাদ, মৃ. ৭২৮ হি:।

৫। ইরাকের মুফতী আল্লামা জামালুদ্দীন আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আকুলী, মৃ. ৭২৮ হি:।

৬। ফকীহ জামালুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আবদুর রহমান আসসালেহী, মৃ. ৭২৮ হি: (তাজতিরাহ পৃ: ৪/১৪৯৮)

৭। হাফিয জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ আল মিযযী, মৃ. ৭৪২ হি:।

৮। কাযী সা'দুদ্দীন আবু মুহাম্মদ মাসউদ ইবনু আহমদ আল হারেসী, মৃ. ৭১১ হি:।

৯। আল্লামা শামসুদ্দীন ইবনুল কাইয়্যিম, ৭৫১ হি:।

১০। আল্লামা ইবনু কাসীর, ৭৭৪ হি:।

১১। আল্লামা আয যাহাবী, মৃ. ৭৪৮ হি:।

১২। আল্লামা ইমাম শরফুদ্দীন, মৃ. ৭০৫ হি।

উপসংহার

ইবনু তাইমিয়া একটি নাম, একটি ইতিহাস। তিনি ছিলেন কালজয়ী মহান ব্যক্তিত্ব। দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি একদিকে ইসলামকে শিরক, বিদআত, কুফর ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে সফল হন। অন্যদিকে তাতারীদের বিরুদ্ধে মুসলিম শাসকদেরকে উজ্জীবিত করে রাজনৈতিকভাবে মুসলিম মিল্লাতকে সুসংহত করার কাজ অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যান। তাঁর দীর্ঘ সাতষট্টি বছরের জীবন কালের মধ্যে চল্লিশটি বছর ছিল বাতিলের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব সংগ্রামের বছর। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী আজও বাতিল ও শিরকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। আজ তাঁর লেখনীর অমৃত ধারা থেকে সুধা পান করে– উলামা সম্প্রদায় উজ্জীবিত হচ্ছে। অন্যদিকে বিদ'আত ও শিরকের পূজারীরা কিন্তু বসে নেই। তারা ইমামের বিরুদ্ধে বই পুস্তক লিখে তাঁর আন্দোলনকে নির্বাপিত করতে চাচ্ছে। কিন্তু সত্যের জয় হবে নিশ্চয়ই।

يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. (الصف : ٨)

তারা আল্লাহর নূরকে ফুৎকারে নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতা দান করবেনই। যদিও কাফিররা একে অপছন্দ করে। (সূরা সাফ-৮)

সহায়ক গ্রন্থ

১। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, আল্লামা ইবনু কাসীর (রহ), ২য় সংস্করণ, ১৯৭৭ সাল, বাইরূত।

২। ইবি কোষ = সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬ সাল।

৩। সংগ্রামী জীবন = ইমাম ইবনু তাইমিয়ার সংগ্রামী জীবন, আবদুল মান্নান তালিব, বদ্বীপ প্রকাশনী, মে ২০০৬।

৪। তাজকিরাহ = তাজকিরাতুল হুফফায, হাফিয আয্ যাহাবী (রহ), ২য় খণ্ড।

৫। ভূমিকা ফাতওয়া : মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়ায়ে ইবনু তাইমিয়া (রহ), ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ।

৬। সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

৭। আর রিসালাতুল মুস্তাতরফা, (الرسالة المستطرفة) সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ বিন জা'ফর কাত্তানী, দারুল কুতুব আলইসলামিয়া, বাইরূত। (২য় খণ্ড)

“শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব (রহ) ঃ জীবন ও কর্ম”

ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ

ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ কর্তৃক প্রণীত "শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব (রহ) জীবন ও কর্ম" শীর্ষক গবেষণাপত্রটির কপি প্রথমে তেইশজন ইসলামী চিন্তাবিদদের নিকট পাঠানো হয়। অতপর জুলাই ২৪, ২০০৮ তারিখে গবেষণাপত্রটি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত "স্টাডি সেশনে" উপস্থাপিত হয়।

উক্ত স্টাডি সেশনে গবেষণাপত্রটির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মূল্যবান পরামর্শ পেশ করে বক্তব্য রাখেন মাওলানা মুহাম্মাদ আতিকুর রহমান, ড. মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, অধ্যাপক এ.এন.এম. রাফিকুর রাহমান, মুফতী মুহাম্মাদ আবু ইউসুফ খান, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান, জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম, জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান, ড. আ. ছ. ম. তরিকুল ইসলাম, ড. আ. জ. ম. কুতবুল ইসলাম নু'মানী, ড. মুহাম্মাদ আবদুল কাদির ও মাওলানা মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহ্হাব (রহ) ঃ জীবন ও কর্ম

ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ

ভূমিকাঃ

মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব ইসলামের ইতিহাসে একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। তিনি যামানার মুজাদ্দিদ, মুজতাহিদ ও সফল সংস্কারক হিসাবে ইসলামী বিশ্বে ব্যাপকভাবে খ্যাতি অর্জন করেন। মুসলিম বিশ্বে যখন ইসলামী আকীদাহ বিশ্বাস ও তাহযীব তামাদ্দুন চরম বিপর্যয়ের মুখে, শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কার দ্বারা সমাজ আচ্ছাদিত তখন এই মহান ব্যক্তিত্বের গৃহীত কুরআন, সুন্নাহ ও সালফে সালিহীনের অনুসৃত দাওয়াত ও সংস্কারমূলক কাজগুলো সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখে। মূলতঃ তিনি কুরআন, সুন্নাহ ও সালফে সালিহীনের অনুসরণে খাঁটি তাওহীদ এবং ঈমান আকীদাহর সঠিক ধারণা পেশ করেন এবং ইসলামের প্রকৃত তাহযীব তামাদ্দুন, সামাজিক রীতিনীতি ও দীনী সংস্কৃতির সুস্থ ধারার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। সমাজ থেকে শিরক, বিদ'আত ও ইসলাম বিরোধী যাবতীয় অপসংস্কৃতির মূলোৎপাটন করেন। দীন ইসলামকে ধর্ম ও রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। দাওয়াত, জিহাদ এবং সর্ব ক্ষেত্রে শরীয়াতকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন। ধর্ম ও রাজনীতির বিভাজন দূর করেন এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তখনকার মতো বর্তমান সময়েও একদিকে সূফী দর্শনের ছত্রছায়ায় শিরক ও বিদ'আতকে ব্যাপকভাবে প্রবর্তনের চেষ্টা, অন্যদিকে পশ্চিমা জগতের কাছে ইসলামকে নতুন রূপে উদার হিসাবে পরিচিত করানোর জন্য ইসলামের সুস্পষ্ট কিছু নীতিমালাকে কাটছাট করে 'আধুনিক ইসলাম' এর ধারণা পেশ এবং 'তাওহীদুল আদইয়ান' বা সকল ধর্মকে একত্রীকরণের প্রচেষ্টা জোরদার হচ্ছে। তাই দীনের সঠিক দাওয়াত, দীনকে ধর্ম ও রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা, দীনের পরিপন্থী আকীদাহ বিশ্বাস ও রীতিনীতির মূলোৎপাটন, সর্বোপরি দীনের সকল নীতিমালায় কুরআন, সুন্নাহ এবং সালফে সালিহীনের নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে তাঁর 'জীবন ও কর্মে' মুসলিম জাতির জন্য অনেক বড় উপাদান ও পাথেয় রয়েছে। বক্ষ্যমান গবেষণা কর্মটি মুসলিম জাতি ও ইসলামের জন্য তাঁর বিশাল অবদানের স্বীকৃতির ক্ষেত্রে সামান্য সংযোজনের ক্ষুদ্র প্রয়াস।

মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের সময় মুসলিম বিশ্বের অবস্থাঃ

হিজরী অষ্টম শতাব্দির শেষ ভাগে ইসলামী বিশ্ব চিন্তার জগতে বিরাট অধপতনের সম্মুখীন হয়। ইজতিহাদের দরোজা ও নতুন নতুন চিন্তার দিগন্ত অনেক দিন আগে থেকেই যেন বন্ধ হয়েছিল। আলিম উলামা নিজেদেরকে কেবল পরবর্তী সময়ের

পণ্ডিতগণের (সাহাবী ও তাবেঈদের পরবর্তী আলিমগণ) লেখা বই পুস্তক এবং টীকা টিপ্পনী পাঠের মধ্যেই নিজেদের ইলমকে সীমাবদ্ধ করে রাখেন। ইসলামী হুকুম আহকাম ও বিধি বিধান পালনের অবস্থা আরো করুণ ছিল। মুসলিম সমাজে নানা ধর্মীয় দলের ছত্রছায়ায় খৃস্টানদের অনুকরণে নানা ধরনের অনুষ্ঠানাদি ধর্মের নামে চালু হয়। এমনকি নেককার ব্যক্তি ও ওলীদেরকে ইলাহর মর্যাদা দিয়ে তাদের ইবাদাত করা হয়। হিজরী দ্বাদশ শতাব্দির (অষ্টাদশ শতাব্দি ঈ.) সূচনা লগ্নে মুসলিমদের আমলী জীবন অধপতনের চরম পর্যায়ে পৌছে, যা দেখে অমুসলিমরা পর্যন্ত অনুশোচনা করেন এবং সাহাবীদের যুগে মুসলিমদের অবস্থা এবং বর্তমান মুসলিমদের বাস্তব অবস্থার মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে তারা নিজেরাই রীতিমত বিস্মিত হয়ে উঠেন। মুসলিমদের এই করুণ অবস্থার চিত্র তুলে ধরে আমেরিকার বিখ্যাত লেখক মিঃ লোথরপ স্টুডার্ড (Lothrop Stoddard) বলেনঃ "ইসলাম ধর্মের অবস্থা ছিল এরূপ যে, এ ধর্মকে ঘন জম কাল চাদর দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছিল। রিসালাতের ধারক মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেই নির্ভেজাল ও খাঁটি তাওহীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাতে কুসংস্কার ও সূফীবাদের প্রলেপ দিয়ে তাওহীদকে কলংকিত করা হয়েছিল। মসজিদগুলো প্রকৃত নামাযী মুক্ত হয়ে পড়ে। মূর্খ, ভণ্ড ফকীর ও পরজীবীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় যারা তাদের গলায় তাবীজ তুমার এবং তাসবীর দানা নিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়ায় এবং মানুষদেরকে সন্দেহ সংশয়ের মধ্যে ফেলে রাখে। মুসলিমদেরকে পীর ও ফকীরদের কবর যিয়ারত এবং তাদের নিকট সুপারিশ করার জন্য উৎসাহ দেয়। কুরআনের শিক্ষা থেকে মানুষ ক্রমশঃ দূরে সরে যায়। মদ পান, অশ্লীলতা, ব্যভিচার ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। পবিত্র মক্কা ও মদীনা মুনাওয়ারাকে পর্যন্ত অন্যান্য শহরের মতো মনে করা হয়। এক কথায় মুসলিমগণ অমুসলিমদের পর্যায়ে এমন কি তার চেয়েও অধপতনে চলে যায়।[১]

এ প্রসঙ্গে আব্দুল মুতাআ'ল আল সাঈ'দী বলেনঃ এ সময় মুসলিমদের ধর্মীয় অবস্থা এতটাই নাজুক হয়ে পড়ে যে, প্রকৃত ইসলামী আকীদাহকে মুসলিম আকীদাহর পরিপন্থী মনে করা হয়। ফকীর দরবেশদেরকেই ইসলামের মূল প্রতিনিধি হিসাবে মেনে নেয়া হয় । এ সকল ফকীর ও দরবেশদের নৈতিক অবস্থার চরম অধপতন সত্ত্বেও তাদেরকে বুযুর্গ ব্যক্তি ও আল্লাহর ওলী ভেবে অতি সম্মান করা হয়। তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের আনুকুল্যে সমাজে গান বাজনা, মদ, মেয়ে নিয়ে অপকর্ম ধর্মের নামে পরিচালনা করতে থাকে। নানা প্রকারের বিদ'আত ও অপসংস্কৃতির প্রচলন ইসলাম ধর্মের নামেই তারা দাপটের সাথে করে। এমন কি পাগল, উন্মাদ ও অথর্ব ব্যক্তিদেরকেও আল্লাহর ওলী (বর্তমানে বাবা) মনে করা হয়। মিশরে শায়খ আল বাকরী (মৃঃ ১২০৭ হিঃ/

১. লোথরপ স্টুডার্ড, 'হাদির আল আলাম আল ইসলামী', আরবী অনুবাদঃ আযায নুওয়াইহিদ, (দারুল ফিকর আল আরাবী, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৯৭৪ইং) ১ম খং, পৃঃ ৩৪।

১৭৯২ ইং) নামক একজন ব্যক্তি রাস্তায় উন্মাদ অবস্থায় উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করতো। তাকেও মিশরবাসীরা আল্লাহর ওলী মনে করে তার ভেতর অনেক কারামাত রয়েছে বলে বিশ্বাস করতো।[২]

হিজাযের অবস্থাঃ

বর্তমান সউদী আরবের পবিত্র মক্কা , মদীনা মুনাওয়ারা, জিদ্দা , তায়েফ সহ পশ্চিম অঞ্চলকেই হিজায বলা হয়। মুসলিম বিশ্বের চরম শোচনীয় অবস্থার বিষাক্ত ছোবল থেকে এ অঞ্চলটিও মুক্ত ছিলনা। শিরক ও বিদ'আত মূলক কার্যক্রম এখানেও ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল। বস্তুতঃ এখানে অবস্থিত ইসলামের প্রাণ পুরুষ ও সাহাবায়ে কিরামের কবরগুলোকে কেন্দ্র করে শিরক ও বিদআ'তী কার্যকলাপ চলতে থাকে। মক্কা মুকাররমাতে রয়েছে খাদীজাহ (রা) এর কবর। তায়েফে রয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনুল আব্বাসের (রা) কবর। আর মদীনা মুনাওয়ারাতে রয়েছে হামযার (রা) কবরসহ উহুদে শাহাদাতবরণকারীদের কবর। জান্নাতুল বাকীতে রয়েছে অসংখ্য সাহাবীর কবর। সর্বোপরি মদীনাতেই রয়েছে আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর। এ সকল কবরগুলোকে কেন্দ্র করে কি ধরনের শিরক ও বিদ'আত মূলক কর্মকান্ড অনুষ্ঠিত হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। যিয়ারতে এসে মুসলিমরা এ সকল কবরে সিজদাহ দিতো, কবরবাসীকে ডাকতো, সাহায্য প্রার্থনা করতো, বরকত হাসিলের চেষ্টা করতো। তাছাড়া রোগ মুক্তি, বিপদ মুক্তি ও অকল্যাণ দূর করার জন্য কাকুতি মিনতি করা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক কাজ।

ইয়ামান, সিরিয়া, মিশর ও ইরাকেও মুসলিম মনিষীদের কবরকে কেন্দ্র করে নানা বিদ'আত ও শিরকমূলক কর্ম কান্ড সংঘটিত হতো। বিশেষ করে ইরাকে ইমাম আবু হানীফাহ ও শায়খ আব্দুল কাদির জিলানীর কবরকে কেন্দ্র করে শিরকী কাজ চলতো।[৩]

সার্বিক বিবেচনায় মুসলিম বিশ্বের শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা দিয়ে পাশ্চাত্যের গবেষক গারিত (Garite) বলেনঃ অষ্টাদশ শতাব্দিতে মুসলমানদের আবেগ ও উচ্ছ্বাস শীতল হয়ে পড়ে। তাদের খলীফা নামক শক্তিটিও তার শক্তি হারিয়ে ফেলে। আরব দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের লোকেরা খলীফার নেতৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করে। ইয়ামানবাসীরা তো অনেক আগে থেকেই তাদের আনুগত্যের হাত গুটিয়ে রেখেছিল। মক্কার অভিজাত বাসিন্দারা তাদের নেতার বিরুদ্ধাচরণ তো খৃস্টানদের চেয়েও অধিক পরিমাণ করতো। ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও থাকার অনুভূতি তাদের মধ্যে মোটেও ছিল না। আধ্যাত্মিকতার প্রাণ কেন্দ্র মক্কাতেও মানুষেরা বস্তুগত ভোগ বিলাসে মত্ত ছিল। আল্লাহর ভয় এবং পরকালের চিন্তা তাদের মধ্যে ছিল বলে মনে হতো না। একই সময় ব্রিটেনের

---

২. আব্দুল মুতাআ'ল আল সাঈ'দী, 'আল মুজাদ্দিদুনা ফিল ইসলাম মিনাল কারনিল আওয়াল ইলাল কারনি আল রাবি' আশার', (কায়রোঃ আল হামামী মুদ্রণ প্রেস) পৃঃ ৪২১, ৪২৩।

৩. হুসাইন ইবনু গান্নাম, 'রাওদাতু আল আফকার ওয়াল আফহাম', (মিশরঃ মোস্তফা আল বাবী আল হালাবী, ১৯৪৯ ইং), ১ খঃ, পৃঃ ১০।

খৃস্টানেরা তাদের চোখের সামনেই মুসলিমদের দেশ ভারতবর্ষ জয় করেছে। কাফির সৈন্যগণ তুরস্কের ইসলামী খিলাফাতের ভূমি পদদলিত করেছে। কিন্তু দুঃখ জনক হলেও সত্য যে, এ সব ঘটনা আরব মুসলিমগণের অনুভূতিতে এতটুকুন সাড়া জাগাতে পারেনি। তারা ছিল অনুভূতিহীন জড় পদার্থের মতো নিথর নিস্তব্ধ। বর্তমান সময়ের ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং রাশিয়ার প্রতি মুসলিম জাতির যে পরিমাণ ক্ষোভ ও ক্রোধ বিদ্যমান রয়েছে তার কণামাত্রও তখনকার সময়ের মুসলিমদের ছিল না। ক্ষোভ না থাকলে প্রবল আবেগও ভোঁতা হয়ে যায়। মোদ্দা কথা হলো ইসলামের গতি ছিল তখন চরম অধপতনের দিকে। রেনেসাঁর যে জোয়ার উনবিংশ শতাব্দিতে সুদূর আফ্রিকা ও চীন পর্যন্ত পৌছেছিল, এমন রেনেসাঁর কথা ঐ সময় কারো পক্ষে চিন্তা করাও অসম্ভব ছিল।[৪]

এ সব লেখকের উক্তির মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের অবস্থা দিনের আলোর মতো ফুটে উঠে যে, মুসলিম জাতির মধ্যে বিভেদ, অনৈক্য, নৈতিক অধপতন, ভোগ বিলাস, শিরক, বিদ'আত, নানা কুসংস্কার এবং ইসলামী আকীদাহ ও ঐতিহ্যের পরিপন্থী সকল আচার আচরণের ফলে তাদের মধ্যে দীন ইসলামের সঠিক চিন্তা চেতনার অপমৃত্যু ঘটে।

মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহ্হাবের সময় নজদের অবস্থাঃ

উপরোক্ত যৎকিঞ্চিত বর্ণনা থেকে পবিত্র নগরী মক্কা ও মদীনা সহ ইসলামী বিশ্বের তৎকালীন সার্বিক শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। তবে আরব উপসাগরীয় অঞ্চলের হৃদপিন্ড নামে পরিচিত নজদের অবস্থা ছিল আরো মারাত্মক ভয়াবহ। নজদবাসীরা চারিত্রিক অধপতনের সীমা লংঘন করে অধপতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ছিল। তাদের সমাজে ভাল ও মন্দের কোন বাছ বিচার ছিল না। পৌত্তলিক আকীদাহ বিশ্বাস এবং মূর্তি পূজার ধ্যান ধারণা তাদের অন্তর সমূহে সুদৃঢ় অবস্থান নিয়েছিল। বরং তাদের অনেকেই এ সকল কুসংস্কার এবং শিরকী কাজগুলোকেই দীনের সঠিক নমুনা বলে বিশ্বাস করতো।

জুবাইলাহ এলাকাতে "যায়িদ ইবনুল খাত্তাবের (রা)" কবর পূজা করা হতো। দারঈয়্যাতে অনেক সাহাবীর কবর ও মাযার আছে বলে দাবী করা হতো এবং সেগুলোকে জাহেলী যুগের মতো ইবাদাত বন্দেগীর কেন্দ্র বলে মনে করা হতো। গুবায়রা নামক স্থানে "যিরার ইবনু আযওয়ারের (রা)" কবরকে কেন্দ্র করে মেলা বসতো এবং সেখানে নানা ধরণের বিদ'আতী কর্মকান্ড ও কুসংস্কারপূর্ণ কার্যাবলী সংঘটিত হতো । বালীদাতুল ফিদ্দা নামক স্থানে "আল ফাহ্হাল" নামক একটি প্রাচীন বৃক্ষের সাথে যুবক ও যুবতীরা কি করতো তা প্রকাশ করার মতো নয়। সেখানে বন্ধ্যা ও সন্তানহীন নারীগণ সন্তানের আশায় ঐ গাছটির সাথে সরাসরি সংগম কাজে লিপ্ত হতো। শুধু তাই নয় বরং দারঈয়্যাহ শহরের নিকটে একটি গর্ত ছিল যেখানে সব

৪. তিনি ১৯০৪ইং সনে Penetration of Arabia নামক বই লেখেন।

ধরণের অশ্লীল ও ব্যভিচারমূলক কার্যক্রম চলতো। মজার ব্যাপার হলো এ সব কিছুই আল্লাহর দীনের নামে চলতো।[৫]

নজদের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল আরো মারাত্মক, শোচনীয়। নজদের সমস্ত এলাকা জুড়ে গৃহ যুদ্ধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলছিল। নজদের উত্তর প্রদেশ ছিল বনু খালেদ গোত্রের দখলে। যেখানে তাঈ ও আল হাসা গোত্র বসবাস করতো। দারঈয়্যাহ ছিল "আ'নাযাহ" গোত্রের অধীনে। দারঈয়্যার নিকটবর্তী বর্তমান রিয়াদ শহরের অন্তর্ভুক্ত মানফুহা দাওস গোত্র শাসন করতো। এক কথায় নজদ অঞ্চলটির আয়তন ও ব্যাসার্ধ যথেষ্ট ছোট ও সংকীর্ণ হওয়া সত্বেও অনেকগুলো ছোট ছোট রাষ্ট্র ও ইমারতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।[৬]

মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহ্হাবের জন্মঃ

১১১৫ হিঃ মুতাবিক ১৭০৩ ঈ. এমনি এক দুরবস্থা এবং অন্ধকার সময়ে মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব সউদী আরবের বর্তমান রাজধানী রিয়াদের পশ্চিম উত্তর দিকে অবস্থিত উয়াঈনাহ্ শহরের একটি শিক্ষিত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর নসবনামা হলোঃ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব ইবনু সোলায়মান ইবনু আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু রাশিদ ইবনু বারিদ ইবনু মুশরিফ ইবনু উমার ইবনু মি'দাদ ইবনু যাহির ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আলাভী ইবনু উহাইব আল তামীমী।[৭]

তাঁর দাদা শায়খ সোলায়মান ছিলেন ঐ সময়ের বিখ্যাত আলিমে দীন। পবিত্র হজ্বের উপর তাঁর লেখা বিখ্যাত "আল মানাসিক" বইটি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীরা অনুসরণ করে থাকেন। শুধু তাই নয় তাঁর চাচা ইবরাহীম ইবনু সোলায়মানও ছিলেন একজন উঁচু মাপের আলিমে দীন। চাচাতো ভাই আব্দুর রহমান ইবনু ইবরাহীমও ছিলেন মস্তবড় ফিকাহবিদ ও সাহিত্যিক। পিতা আব্দুল ওয়াহ্হাব ইবনু সোলায়মান (১১৫৩ হিঃ) তো ছিলেন বিশিষ্ট ফিকাহবিদ। তিনি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত উয়াঈনাহ ও হুরাইমালা অঞ্চলের বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

বাল্যকালঃ

মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব অত্যন্ত তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন ও মুখস্থ শক্তির অধিকারী ছিলেন। দশ বৎসর বয়সের পূর্বেই তিনি কুরআন কারীম মুখস্থ করেন। পিতার নিকট হাম্বলী মাযহাবের ফিকাহর কিতাবাদি পাঠ করেন এবং ছোট কালেই হাদীছ ও

৫. মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ আল সালমান, 'দাওয়াতু আল শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দিল ওয়াহ্হাব ওয়া আছারুহা ফিল আলাম আল ইসলামী, (সৌদী আরব, ধর্ম মন্ত্রণালয়, ১ম, সংস্করণ, ১৪২২ হিঃ), পৃঃ ২১ - ২২ ।

৬. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৭।

৭. শায়খ ইসমাঈল মুহাম্মাদ আল আনসারী, "হায়াত আল শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব", বুহুছ নাদওয়াতি দাওয়াতি আল শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব এর অন্তর্গত একটি প্রবন্ধ, (আল ইমাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১ ইং), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৯ – ১২০ ।

তাফসীরের কিতাবগুলো অধ্যয়ন করেন। তাঁর মেধা দেখে তাঁর পিতা পর্যন্ত আশ্চর্য হতেন। এমন কি শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করার সময় ছেলের জ্ঞান থেকেও তিনি উপকৃত হতেন। এ কারণে তিনি ছেলেকে ছোট কাল থেকেই নামাযের ইমামতির জন্যে এগিয়ে দিতেন। তরুণ বয়সেই হজ্জ্ব আদায় করেন। মদীনা মুনাওয়ারাতে দুই মাস কাল অবস্থান করার পর তিনি নিজের এলাকা উয়াঈনাতে ফিরে যান এবং পিতার নিকট থেকে জ্ঞানার্জন ও বিভিন্ন বই পুস্তক লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

বিবাহ ও সন্তানাদিঃ

শায়খের (রহঃ) বিবাহ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস থেকে যতদূর জানা যায় তাহলোঃ ১১৫৩ হিজরী সনে পিতার মৃত্যুর পর তিনি উয়াইনাহতে গমন করেন এবং সেখানকার শাসক উছমান ইবনু হামাদ ইবনু মা'মারের ফুফু এবং যুবরাজ আব্দুলাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হামাদ ইবনু মা'মারের কন্যা জাওহারাকে বিবাহ করেন। শায়খের জীবনীর উপর গবেষণাকারীদের অন্যতম শায়খ হামাদ আল জাসির বলেনঃ " শায়খের এটাই প্রথম বিবাহ। কেননা পিতার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি হিজায, বাসরা এবং আহসা অঞ্চলে বিদ্যা অর্জনের জন্য অস্থায়ীভাবে বসবাস করেন। নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের কেউই এ কথা উল্লেখ করেননি যে শায়খ উয়াইনাতে বসবাস শুরু করার আগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন"।[৮] কোন কোন লেখক অবশ্য উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ছোট বয়সেই বিয়ে করেন।[৯] কেউ কেউ তো এতদূর বলেছেনঃ শায়খ ইলম অর্জনের জন্য নিজ ঘর থেকে বাইরের দেশে বের হওয়ার সময় তাঁর তিনজন স্ত্রী, দুই ছেলে এবং দুই কন্যা সন্তান ছিল।[১০] তবে গবেষক শায়খ হামাদ আল জাসির এ দাবীকে নাকচ করে দিয়ে বলেন যে, এটি একটি উদ্ভট ও কাল্পনিক উক্তি।[১১]

মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের যে সব সন্তানাদির উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁরা হলেনঃ

(১) হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব (মৃঃ ১২২৪হিঃ)। তিনি দারঈয়্যাহর কাজী (বিচারক) ছিলেন। তাছাড়া ফিকাহ ও তাফসীরের উপর তিনি নিয়মিত ক্লাস নিতেন। তাঁকে তাওহীদবাদীদের মুফতি ও আল্লামা মনে করা হতো।

---

৮. বুহুছ নাদওয়াতি দাওয়াতি আল শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব এর অন্তর্গত একটি প্রবন্ধ, লেখকঃ শায়খ হামাদ আল জাসির (আল ইমাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১ ইং), ১ম খন্ড, পৃঃ ১৬৯।

৯. মাসউদ নাদভী, মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহাব মুসলিহুন মাযলুম, পৃঃ ৩২।

১০. লেখক অজ্ঞাত, লুমাউশ শিহাব ফী সীরাতে মুহাম্মাদ বিন আব্দিল ওয়াহহাব, কিং আব্দুল আযীয প্রিন্টিং প্রেস, পৃঃ ১৯।

১১. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৬৯।

(২) আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব। তিনি অত্যন্ত পরহেযগার ও দীনদার আলিম ছিলেন। এ বিষয়ে লোকেরা তাঁকে উপমা হিসাবে পেশ করতো। তাঁর উপর বিচারকের দায়িত্ব আসলে তিনি তা গ্রহণ করেন নি।

(৩) আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব (মৃঃ ১২৩৩হিঃ)। তিনি অনেক বড় মাপের আলিমে দীন ছিলেন। দারঈয়্যাহর বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

(৪) ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব। তিনিও একজন খ্যাতিসম্পন্ন আলিমে দীন ছিলেন। তিনি নিয়মিত ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর দারস পেশ করতেন।

(৫) হাসান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব। তিনি শায়খ মুহাম্মাদের 'কিতাবুত তাওহীদের' শারহ "ফাতহুল মাজীদ ফী শারহি কিতাবিত তাওহীদ" সহ অন্যান্য প্রসিদ্ধ বই পুস্তক লিখেছেন।

(৬) আব্দুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব। তিনিও একজন প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন।

উল্লেখ্য তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের পিতা শায়খ মুহাম্মাদের ছাত্র ছিলেন। তাঁরা যোগ্য পিতার নিকট বিদ্যা অর্জন করে প্রত্যেকেই ইলমী ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখেন।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের জীবনীকারগণ তাঁর দুজন কন্যা সন্তানের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের একজন ইমাম আব্দুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সউদের স্ত্রী ছিলেন। তাঁর গর্ভে উমার ইবনু আবদিল আযীয এবং আব্দুল আযীয ইবনু আবদিল আযীয জন্ম গ্রহণ করেন।[১২] আর দ্বিতীয় জন শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের শিষ্য ও তাঁর দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক খ্যাতিমান আলিম শায়খ হামাদ ইবনু ইবরাহীমের (মৃঃ ১১৯৪ হিঃ) স্ত্রী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর শায়খ মুহাম্মাদের আরেক জন স্বনামধন্য ছাত্র ও আন্দোলনের সাথী মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু গারীরের (মৃঃ ১২০৯ হিঃ) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।[১৩]

মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের বিদ্যা অর্জনঃ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শায়খ মুহাম্মাদ তাঁর শিক্ষা জীবন নিজ বাড়িতে পিতার নিকটই শুরু করেন। কিন্তু শিক্ষার প্রতি প্রবল আকাঙ্খা এবং শিক্ষানুরাগী হওয়ার কারণে বিশ বছর বয়সে দীনী ইলমের সন্ধানে জ্ঞানের বিভিন্ন এলাকা ও কেন্দ্রগুলোতে সফর করেন। বিশেষ করে ওহীর জ্ঞানের প্রাণ কেন্দ্র হিজায অঞ্চল সফর করে ইলমের বৈঠকের নিয়মিত ছাত্র হয়ে যান। এ সময় তিনি মসজিদে নববীতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন

১২. উল্লেখ্য যে, আরব দেশে এখনও কোন কোন পরিবারে পিতা ও পুত্রের একই নাম রাখা হয়।

১৩. শায়খ হামাদ আল জাসির, প্রাগুক্ত খঃ ১, পৃঃ ১৮২-১৮৮।

দারসে হাজির হতেন। বিশেষ করে প্রসিদ্ধ আলিমগণের সাহচর্য ও জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ দিন তাঁদের সাথে অবস্থান করেন ও ইলমে দীন হাছিল করেন। তারপর তিনি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে ইরাকের বসরাতে গমন করেন এবং প্রখ্যাত আলিমগণের নিকট দীনী ইলম অর্জন করেন।

সাইয়্যেদ সোলায়মান নদভী উল্লেখ করেছেন যে, বিখ্যাত আলিমে দীন শাহ ওয়ালি উলাহ দিহলভী রহঃ (১১৭৬ হিঃ) এবং শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব উভয়ই ইলমে দীনের একই ভান্ডার, মসজিদে নববী থেকে শিক্ষা অর্জন করেন। তাঁদের জ্ঞানার্জনের প্রকৃত উৎসও অভিন্ন ছিল। আর তা ছিল কুরআন ও সুন্নাহ।[১৪]

সেখান থেকে সিরিয়া সফর করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক সংকটের কারণে আহসা অঞ্চল হয়ে নজদের হুরাইমালাতে ফিরে আসেন, যেহেতু তার পিতা আব্দুল ওয়াহহাব উয়াঈনা থেকে ১১৩৯ হিজরীতে আহসাতে স্থানান্তরিত হন।

প্রাচ্যবিদ মার্গালিয়োৎ এর বরাত দিয়ে কিছু কাল্পনিক ও মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে যে, শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব বাগদাদ গমণ করেন এবং সেখানে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এমনকি তিনি কুর্দিস্তান, হামদান, কুম এবং ইসপাহান অঞ্চলেও সফর করেন এবং সেখানে বসবাস করেন।[১৫] একইভাবে প্রাচ্যবিদ মি ডাবিউ ফোর্ড ব্রাইজেস (A brief history of Wahhaby. p. 7) ,মিঃ তোমাস পি. হিউজেষ (Dictionary of Islam "Wahabia" পৃঃ ৬৫৯), য়ুয়াইমার (Arabia, The Cradle of Islam, পৃঃ ১৯২) সহ আরো কতিপয় লেখক শায়খের উপরোক্ত অঞ্চলগুলোতে সফর করার বিবরণ দিয়েছেন যা ঐতিহাসিকভাবে সমর্থিত নয়। বস্তুতঃ তিনি বসরার বাইরে বাগদাদ, সিরিয়া ও মিশরে কখনো গমন করেননি। কারণ শায়খের জীবনী সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ওয়াকিফহাল শায়খ হুসাইন ইবনু গান্নাম (মৃঃ ১২২৫হিঃ) এবং উছমান ইবনু বিশর (মৃঃ ১২৮৮হিঃ) লিখিত গ্রন্থাদিতে এ সব দেশে তাঁর সফরের কোন উল্লেখ নেই। তাছাড়া এ সব দেশে সফর ও সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে বিদ্যা অর্জন যদি সত্য হতো তাহলে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের লিখিত অসংখ্য বইয়ে ন্যূনতম হলেও এর উল্লেখ বা আভাস পাওয়া যেত।[১৬]

মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের কয়েকজন খ্যাতনামা শিক্ষকের নামঃ

শায়খ মুহাম্মাদ রহঃ অনেক শায়খের নিকট শিক্ষা লাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেনঃ

---

১৪. মাসউদ নদভী, মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহাব মুসলিহুন মাযলুম, আল ইমাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪ইং, পৃঃ ৩৩।

১৫. উছমান ইবনু বিশর, উনওয়ান আল মাজদ ফী তারীখে নাজদ: সৌদী শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক মুদ্রিত, ২য় সংস্করণ, খঃ ১, পৃঃ ২৬ ।

১৬. মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ আল সালমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬ – ২৮ ।

১) তাঁর স্বনাম ধন্য পিতা আব্দুল ওয়াহহাব (রহ)। যিনি নজদ অঞ্চলের মুফতি ছিলেন। শায়খ তাঁর নিকট থেকে অন্যান্য বিষয় সহ ফিকাহ শাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর সনদ ও বর্ণনাসূত্র ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল পর্যন্ত পৌছে।

২) শায়খ আব্দুলাহ ইবনু ইবরাহীম ইবনু সাইফ আল নাজদী আল মাদানী। তিনি আলিমকুলের শিরোমনি ছিলেন এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জনের আশায় মসজিদে নববীতেই অবস্থান করেন। শায়খ মুহাম্মাদ তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শাস্ত্রের উপর শিক্ষা লাভ করেন।

৩) শায়খ মুহাম্মাদ হায়াৎ আল সিন্দি আল মাদানী (মৃঃ ১১৬৫ হিঃ)। তিনি বিখ্যাত হাদীছ বিশারদ ছিলেন। শায়খ মুহাম্মাদ তাঁর ছাত্র হবার সুবাদে দীর্ঘ সময় তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেন। খাঁটি তাওহীদ, অন্ধ অনুকরণের গোলামী থেকে মুক্তি এবং কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে তাঁর উপর তাঁর বিরাট প্রভাব ছিল।

৪) শায়খ মুহাম্মাদ আল মাজমূয়ী আল বাসরী। শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব বসরাতে তাঁর নিকট হাদীছ এবং আরবী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন এবং তাঁর সান্নিধ্যেই থাকেন।[১৭]

৫) শায়খ আলী আফিন্দী আল দাগিস্তানী আল মাদানী (মৃঃ ১১৯০ হিঃ)। শায়খ মুহাম্মাদ মদীনাতে তাঁর সাথে মিলিত হন এবং তাঁর নিকট থেকে ইজাযত গ্রহণ করেন।

৬) শায়খ আব্দুল লতীফ আল আফালিকী আল আহসায়ী। শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব তাঁর নিকট থেকেও ইজাযত গ্রহণ করেন।

৭) শায়খ ইসমাঈল আল আজলুনী।

৮) শায়খ আব্দুলাহ ইবনু সালিম আল বাসরী (মৃঃ ১১৩০ হিঃ)।

৯) শায়খ সিবগাতুলাহ আল হায়দারী (মৃঃ ১১৯০)।

শায়খ মুহাম্মাদের বিশিষ্ট ছাত্র বৃন্দঃ

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের নিকট থেকে অনেকেই ইলম অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেনঃ

(১) সউদ ইবনু আবদিল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সউদ(মৃঃ ১২২৯হিঃ/১৮১৪ ঈ)। তিনি শায়খের নিকট দুই বছর সর্বক্ষণ অবস্থান করেন এবং তাঁর দীনী দারসগুলোতে নিয়মিত উপস্থিত থেকে শিক্ষা নেন।

---

১৭. উনওয়ান আল মাজদ, প্রাগুক্ত, খঃ ১, পৃঃ ১৮।

(২) হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব (মৃঃ ১২২৪ হিঃ)। তিনি দারঈয়্যার বিচারক ছিলেন।

(৩) আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল আযীয। তিনি একজন বিখ্যাত আলিম ছিলেন। হাদীছ ও ফিকাহ শাস্ত্রের উপর তাঁর যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল। বিচারকের দায়িত্ব দেয়া হলে তিনি তা গ্রহণ করেননি।

(৪) আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব (১১৬৫ হিঃ – ১২৪২হিঃ)। তিনি সউদ ইবনু আবদিল আযীযের সময় দারঈয়্যাহর বিচারক ছিলেন। তিনি সূক্ষ্ম ও প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি মিশরে মৃত্যু বরণ করেন।

(৫) ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব। তিনি প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা শায়খের নিকট কিতাবুত তাওহীদ পাঠ করেন। তিনিও ইলমী মাজলিসে নিয়মিত দারস পেশ করতেন।

(৬) আব্দুর রহমান ইবনু খামীস । তিনি দারঈয়্যাহর আলে সউদের প্রাসাদের ইমাম এবং বাদশাহ আব্দুল আযীয (মৃঃ ১২১৮ হিঃ/ ১৮০৩ ঈ) ও তাঁর পুত্র বাদশাহ সউদের সময় বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

(৭) শায়খ হুসাইন ইবনু গান্নাম (মৃঃ ১২২৫ হিঃ)। প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর লেখা "রওযাতুল আফকার ওয়াল আফহাম" নামক বইটি শায়খের জীবনীর উপর এক অনন্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

(৮) শায়খ আব্দুল আযীয ইবনু আবদিল্লাহ আল হুসাইন আল নাসিরী (১২৩৭ হিঃ)। তিনি আল ওয়াশাম এলাকার বিচারক ছিলেন। অনেক বছর পর্যন্ত তিনি শায়খের সার্বক্ষণিক সাহচর্যে থেকে ইলম অর্জন করেছেন।

(৯) আব্দুর রহমান ইবনু হাসান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব (১১৯৩ হিঃ – ১২৮৪ হিঃ)। তিনি দাদা শায়খ মুহাম্মাদের নিকট বিদ্যা অর্জন করে অনেক উঁচু মাপের আলিম হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি শিক্ষকতা ও বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

(১০) হামাদ ইবনু নাসির ইবনু উছমান ইবনু মা'মার। তিনি একাধারে বিচারক, লেখক ও মুফতী ছিলেন।[১৮]

মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের আকীদাহ বিশ্বাসঃ

শায়খের আকীদাহ বিশ্বাস ছিল আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়া'তের আকীদাহ বিশ্বাস এবং তাঁদের নীতি মালা ও উসূলের সাথে পরিপূর্ণ সঙ্গতিশীল। এ ক্ষেত্রে তিনি কোন

---

১৮. ড. মানে' ইবনু হাম্মাদ আল জুহানী, আল মাওসূয়া'তু আল মুইয়াসসারাহ ফীল আদয়ান ওয়াল আহযাব আল মুয়া'সারাহ, রিয়াদঃ ওয়ামী (WAMY) প্রেস, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪২০ হিঃ, ১ খঃ পৃঃ ১৬২ – ১৬৩ এবং শায়খ হামাদ আল জাসির, প্রাগুক্ত খঃ ১, পৃঃ ১৪০ –১৪৪

প্রকারের অতিরঞ্জন করেননি। তাঁদের নীতির বাইরেও কোন নতুন মত পোষণ করেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ

" مذهبنا في أصول الدين مذهب أهل السنة والجماعة، وطريقتنا طريقة السلف التي هي الطريق الأسلم الأعلم الأحكم، خلافا لمن قال: طريقة الخلف أعلم ".

"দ্বীনের মৌলিক আকীদাহ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমাদের মাযহাব হলো আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়া'তের মাযহাব। সালফে সালিহীনের বিশুদ্ধ, সঠিক ও মযবুত তরীকাই হলো আমাদের তরীকা। এ ক্ষেত্রে যারা মনে করেন যে, খালাফ বা পরবর্তী লোকদের পদ্ধতি হলো বেশি ভাল আমরা তাদের এ কথার সাথে এক মত পোষণ করি না"।[১৯]

তিনি আল্লাহর সীফাত ও গুণবাচক আয়াত ও হাদীছ সমূহের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করেন। সীফাতগুলোর হাকীকী ও প্রকৃত অর্থেই বিশ্বাস করেন। এগুলোর কোন প্রকার রূপক অর্থ কিংবা ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। তবে সীফাতগুলোর প্রকৃত ধরন ও রূপ কী তা আল্লাহর উপরই ছেড়ে দেন। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন কারীমে এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সহীহ সুন্নাহ দ্বারা মহান পূত পবিত্র আল্লাহর যে সব নাম ও গুণাবলী প্রমাণিত হয় সেগুলোকে কোন প্রকার ব্যাখ্যা, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সাদৃশ্য স্থাপন এবং নিষ্ক্রিয় ও অকেজো করা ছাড়া আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ইমাম মালিকের (রহঃ) একটি প্রসিদ্ধ উদ্ধৃতিও পেশ করেন। তিনি বলেনঃ

"فإنَّ مالكاً وهو من أجل علماء السلف لما سئِلَ عن الاستواء في قوله تعالى : { الرَّحمنُ على العَرش استَوَى) قال : الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة".

"সালাফের উঁচু মানের একজন আলিম ইমাম মালিককে (রহঃ) আল্লাহর বাণী (الاستواء) "ইসতিওয়া" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দেন যে, "ইসতিওয়া" শব্দটি একটি জ্ঞাত শব্দ। কিন্তু এর ধরন অজ্ঞাত, এর প্রতি ঈমান পোষণ করা অপরিহার্য এবং এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদ'আত"।[২০]

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব ইসলামী শরী'য়াহর ফিকহী মাসায়েলের ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের (হাম্বলী মাযহাবের) অনুসারী ছিলেন। তিনি নিরংকুশ ও পূর্ণ ইজতিহাদের দাবীদার ছিলেন না। তবে যে সকল বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাতে সুস্পষ্ট দলীলাদি পাওয়া যায়, যেগুলো মানসূখ ও খাস

---

১৯. "হায়াত আল শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব" প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২১ – ১৩০।
২০. বুহুস নাদওয়াতে দাওয়াতি আল শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহাব, পৃঃ ৪১।

হওয়ার আওতামুক্ত, অন্য কোন সহীহ্ শক্তিশালী দলীলের বিপরীত নয় এবং চার ইমামের কোন একজন বিষয়টি বলেছেন, সে ক্ষেত্রে দলীল ভিত্তিক ফায়সালা গ্রহণ করেছেন। নিজেদের মাযহাবের মতামতকে গ্রহণ করেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ

" نحن في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة دون غيرهم ... ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق، ولا أحد يدّعيه إلا أنا في بعض المسائل إذا صحّ لنا نصٌ جليٌ من كتاب أو سنّة غير منسوخ ولا مخصّص ولا معارض بأقوى منه وقال به أحد الأئمة الأربعة أخذنا به وتركنا المذهب " .

" আমরা ইসলামের ফুরুয়া'ত বা শাখা প্রশাখার ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের মাযহাব অনুসরণ করি। চার মাযহাবের যে কোন মাযহাবের অনুসারীদেরকে আমি প্রত্যাখ্যান করি না...। আমি নিজেকে নিরংকুশ ও পরিপূর্ণ ইজতিহাদের উপযুক্ত বলে দাবী করি না। কেউ হয়তো এ রকম দাবী করেও না। তবে আমার সম্মুখে যদি কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট সহীহ্ দলীল থাকে, যা মানসূখ নয় ও খাস নয় এবং এর চেয়ে শক্তিশালী অপর দলীলের বিপরীত নয়, আর এ বিষয়ে চার ইমামের কেউ উক্তি করেছেন, তাহলে আমি দলীল অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং নিজ মাযহাবের বক্তব্যকে গ্রহণ করি না"।[২১]

শায়খ মুহাম্মাদের মৃত্যুঃ

শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব ১২০৬ হিজরী (১৭৯২ খৃঃ) সনের শাওয়াল কিংবা যুলক্বা'আদাহ মাসে ৯২ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। ইসলামের ইতিহাসের এই মহান ব্যক্তিত্ব সারাটি জীবন তাঁর মনিবের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইসলামের সঠিক দাওয়াত পেশ করেন। কোন বাধা বিপত্তি, নিন্দা ও তিরস্কারের তোয়াক্কা করেননি। তাঁর মৃত্যুতে অনেকেই শোকে মুহ্যমান হয়েছেন। কেউ কেউ শোকগাথাও লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্র হুসাইন ইবনু গান্নাম এবং মুহাম্মাদ ইবনু আলী আল শাওকানী (মৃঃ ১২৫৫ হিঃ) রয়েছেন।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের দাওয়াতী কর্মের সূচনাঃ

বাল্য জীবন থেকেই শায়খ মুহাম্মাদ "সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ" এর প্রতি যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। উয়াঈনাতে প্রাথমিক শিক্ষা জীবনে ফিকাহ এবং হাদীছ অধ্যয়ন কালেই সে সমাজে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত শিরক ও বিদ'আতগুলো দেখে

২১. প্রাগুক্ত ৪০, ৪১।

তিনি ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতেন। ইসলামের মৌলিক নীতির খেলাপ কোন কাজ দেখলে তার প্রতিকার করার জন্য চেষ্টা করতেন।

তিনি মদীনা মনোওয়ারায় শায়খ মুহাম্মাদ হায়াৎ সিন্দী এবং আব্দুল্লাহ ইবনু ইবরাহীম নজদীর নিকট থেকে হাদীছ শাস্ত্র অধ্যয়নের পর মুসলিম সমাজের দিকে নযর দিয়ে দেখেন যে, মুসলিম সমাজ কুসংস্কার ও গোমরাহীর অন্ধকারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। যতদূর জানা যায় তিনি সর্ব প্রথম রাসূল কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের নিকট সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টিকে দেখে প্রতিবাদ করেন। বসরাতে বসবাস করার সময়ও তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন। ফলে তাঁকে সাংঘাতিক মানসিক যাতনা ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়। বসরার দুষ্ট লোকেরা দ্বিপ্রহরের অগ্নি ঝরা রোদের মধ্যে তাঁকে সেখান থেকে বের করে দেয়। তিনি বসরার সন্নিকট যুবায়ের নামক গ্রামের উদ্দেশ্যে বের হন। এ সময় তিনি প্রচন্ড পিপাসায় কাতর ছিলেন। পথ চলতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। তখন আবু হামদান নামক একজন ব্যক্তি তাঁকে সাহায্য করেন। তাঁকে পানি পান করান এবং নিজের গাধার পিঠে করে যুবায়ের গ্রামে পৌছে দেন। শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহাব এর দাওয়াতী কার্যক্রম এ ভাবেই শুরু হয়।

দাওয়াতী কার্যক্রমের পর্যায়সমূহঃ

তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতির অপরিহার্য পরিণতি স্বরূপ শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের দাওয়াতী কার্যক্রম কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করেই একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কার আন্দোলনে রূপ নেয়। যার প্রভাব শুধু উপসাগরীয় অঞ্চলেই নয় বরং সমগ্র মুসলিম দুনিয়াতেই পড়ে। শায়খের জীবন ও কর্মের উপর গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম নিম্নোক্ত পর্যায়সমূহ অতিক্রম করে।

প্রথম পর্যায়ঃ হুরাইমালাতে দাওয়াতী কাজ ঃ

শায়খ মুহাম্মাদ বসরা থেকে হুরাইমালা শহরে প্রত্যাবর্তন করার পর মুসলিম সমাজ থেকে ঈমান আকীদা ও ইসলামের সঠিক ধ্যান ধারণার বিপরীত শিরক ও বিদ'আতের মূলোৎপাটন, নির্ভেজাল ও খাঁটি তাওহীদের প্রচার, নীতি - নৈতিকতা এবং উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টির কাজে আত্ম নিয়োগ করেন। তাঁর দাওয়াতী কাজের মূল ভিত্তি ছিল বিশুদ্ধ তাওহীদ। শ্লোগান ছিল আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করা। সকল প্রকার ইবাদাত নিষ্ঠার সাথে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা। দীর্ঘ কাল থেকে চলে আসা নৈতিক অধঃপতন, চারিত্রিক পদস্খলন, ভ্রান্ত আকীদাহর পরিশুদ্ধি এবং ভঙ্গুর সমাজকে আমূল সংস্কার করার কাজ ছেলে খেলা ছিল না। তাই তিনি অত্যন্ত আগ্রহ ও আন্তরিকতার সাথে গ্রাম গঞ্জের সাধারণ মানুষ এবং যাযাবরদের মাঝে চুরি, ডাকাতি, লুট তরাজ, ধোঁকা ও প্রতারণার পরিবর্তে সংস্কার অনুভূতি এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি ও হৃদ্যতার মানসিকতা তৈরির জন্য কাজ করেন। জাহিল ও মূর্খ মানুষদের আকীদাহর পরিশুদ্ধি এবং তাদেরকে কবর ও খানকাহ পূজা এবং মিথ্যা মা'বুদগুলোর নিকট ধর্ণা

দেয়ার পরিবর্তে প্রকৃত ও সত্য একমাত্র মা'বুদ আল্লাহর নিকট সকল কাজে ধর্ণা দেবার শিক্ষা প্রদান করেন। তখনকার পরিবেশে এই মহান ও কঠিন দায়িত্ব পালন করা সহজ সাধ্য কাজ ছিল না। এ কাজের জন্য প্রয়োজন ছিল খাটি ঈমানী শক্তি এবং সততাপূর্ণ দৃঢ় সিদ্ধান্ত। শায়খ মুহাম্মাদ দাওয়াতী ময়দানে যে সব অবর্ণনীয় নিপীড়ন, অকথ্য নির্যাতন, সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভোগ ধৈর্য, সহনশীলতা ও সহিষ্ণুতার সাথে হাসি মুখে মুকাবিলা করেছেন তা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এ মহান দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে পালন করার উপযোগী প্রয়োজনীয় গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। তিনি মানুষদেরকে তাওহীদের দিকে আহবান করেছেন। এবং আল্লাহ পাক ছাড়া অন্য কোন ওলী, পীর মাযারের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা এবং তাদেরকে মা'বুদ হিসাবে মেনে নিয়ে তাদের ইবাদাত বন্দেগী করতে নিষেধ করেছেন।

তিনি ইসলামী শরীয়াত অনুমোদিত কবর যিয়ারতের মতো একটি সৎকর্মে যে সব বিদ'আতের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তা বন্ধ করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেন। তখনই তাঁর বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিরোধিতা শুরু হয়ে যায়। তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনরা তাঁকে কষ্ট দিতে শুরু করে। এমনকি তাঁর পিতা পর্যন্ত জনরোষের আশংকায় তাঁর দাওয়াতী কাজকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। এতদ সত্বেও তিনি পিতার মর্যাদা এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের সম্মান বজায় রেখেই তাঁর মিশনকে নিয়ে এগিয়ে যান। অন্য দিকে সীমাহীন যাতনা ও কষ্ট উপেক্ষা করে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথেই নিজের অবস্থানে অনঢ় থাকেন। ইতোমধ্যেই তাঁর দাওয়াতী কাজের খবরা খবর এবং শিক্ষা দীক্ষা আল আরেদ, উয়াইনা, দারঈয়্যাহ, রিয়াদ ও অন্যান্য শহর সহ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।

প্রতিকূল পরিবেশ বিশেষ করে তাঁর পিতার অনুৎসাহ ও অসহযোগিতার ফলে তাঁর দাওয়াতী কাজ অতি মন্থর গতিতে চলতে থাকে। ১১৫৩ হিঃ মুতাবিক ১৭৪০ ঈঃ সালে তাঁর পিতার মৃত্যু হলে দাওয়াতী কাজ ব্যাপকভাবে শুরু হয়। তিনি তাঁর দাওয়াতে প্রকাশ্যেই মানুষদেরকে সুন্নাতের অনুসরন এবং বিদ'আত পরিহার করতে আহবান করেন। হুরাইমালার অনেক মানুষই তাঁর দাওয়াত কবুল করেন। এবং তাঁরা তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ জনে পরিণত হন। তাঁরা শায়খকে তাঁর দাওয়াতী কাজে ব্যাপক ভাবে সাহায্য করেন। তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য নিয়মিত দারসে বসেন। এবং তাঁর ওয়াজ নসীহত থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করেন। এই সময়ে শায়খ তাঁর বিখ্যাত বই "কিতাবুত তাওহীদ" লেখেন।[২২]

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ উয়াইনা এলাকায় দাওয়াতী কাজ (১১৫৭ হিঃ/ ১৭৪৪ ঈ) ঃ

নজদের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বিভিন্ন গোত্র, গোত্রপতি সহ শাসকদের মধ্যে অনৈক্যের কারণে সেখানে সামাজিক স্থিতিশীলতা ছিলনা। একইভাবে হুরাইমালার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাও চরম অস্থিরতার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। যা দাওয়াতী

২২. মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান আল সালমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮।

কাজের জন্য মোটেও উপযোগী ছিলনা। তদুপরি শায়খের বিরোধীদের উৎপীড়ন এবং ষড়যন্ত্রের মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমনকি তারা দুষ্ট লোকদের যোগ সাজশে শায়খকে হত্যা করার পরিকল্পনাও গ্রহণ করে।[২৩] তাই শায়খ মুহাম্মাদ চিন্তা করেন যে এ পরিস্থিতিতে দাওয়াতী কাজে সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। তখন তিনি সমস্ত নজদকে একতাবদ্ধ করে একই পতাকাতলে সমবেত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন।

তিনি মনে করেন যে, রাষ্ট্রের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া দেশে বিদেশে তাওহীদের দাওয়াত প্রচার করা সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে তিনি হুরাইমালাতে থাকা অবস্থাতেই উয়াইনার শাসক উছমান ইবনু মা'মারের সঙ্গে চিঠি পত্র আদান প্রদান শুরু করেন। তিনি যখন তাঁকে সত্য গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত আছেন মনে করেন তখন নিজেই উয়াইনাতে চলে আসেন। শাসক উছমান শায়খকে উষ্ণ সম্বর্ধনা ও সম্মান দেন। এ সময় উছমানের ভাতিজী জাওহারা বিনতু আবদিল্লাহ ইবনু মা'মারের সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন । বৈবাহিক সূত্র ধরে উছমানের পরিবারের সঙ্গে শায়খের সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। তিনি এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাঁর নিকট থেকে তাঁর কাজে সাহায্য করার ওয়াদা গ্রহণ করেন। উয়াইনাতে ব্যাপকভাবে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ সহ তাওহীদের দাওয়াত দিতে থাকেন। ফলে প্রায় সমস্ত উয়াইনাবাসী ধীরে ধীরে সত্য দাওয়াত কবুলের জন্য তৈরি হয়ে যায়। উছমানের সহায়তায় তিনি অনেকগুলো বিদ'আতের মূলোৎপাটন করেন। এর মাধ্যমে শায়খের দাওয়াতী কর্ম, হিকমাত এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত প্রদানের স্তর থেকে বাস্তবায়ন ও কার্যকর করার স্তরে রূপ নেয়। এ সময় তিনি নিম্নোক্ত সংস্কারকর্মগুলো সম্পন্ন করেনঃ

(ক) যে বৃক্ষগুলোকে বরকতপূর্ণ মনে করে পূজা করা হতো সেগুলোর শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলা হয়। যেমন, উয়াইনায় অবস্থিত 'আল যীব' (الذيب) এবং দারঈয়্যায় অবস্থিত 'কারইউহ'(قريوه) নামক বৃক্ষ। সেগুলো শায়খ মুহাম্মাদ নিজ হাতে কেটে ফেলেন।

(খ) জুবাইলাতে অবস্থিত ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী যায়িদ ইবনুল খাত্তাব (রা) এর কবরকে কেন্দ্র করে যে সব শিরক ও বিদ'আতী কর্ম কান্ড চলছিল তা বন্ধ করার জন্যে কবরের উপর নির্মিত গম্বুজ ভেংগে ফেলা হয়। এবং কবরকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয়। এখানেও শায়খ সর্বাগ্রে নিজে গম্বুজ ভাঙ্গার কাজ শুরু করেন এবং তারপর সঙ্গী সাথীগণ তাঁকে সহযোগিতা করেন।[২৪]

(গ) জনৈক ব্যভিচারিণী মহিলার উপর রজম কার্যকর করা হয়। মহিলাটি নিজে এসে শায়খ মুহাম্মাদের নিকট স্বীকারোক্তি প্রদান করে তার উপর আল্লাহর হদ কায়েমের আবেদন করেন। মহিলাটি চারদিন শায়খের নিকট এসে একই বক্তব্য প্রদান করলে হদ কায়েমের যাবতীয় শর্ত পূরণ হলে শায়খ তার উপর রজম বাস্তবায়িত করেন। এ ক্ষেত্রে

---

২৩. হুসাইন ইবনু গন্নাম, রওযাতুল আফকার খঃ ১, পৃঃ ৩০।

২৪. উছমান ইবনু বিশর, উনওয়ানুল মাজদ ১/ ৯, ১০।

উয়াইনার শাসক উছমান ইবনু মা'মার সর্বপ্রথম মেয়েটিকে পাথর মারা শুরু করেন।[২৫] স্বভাবতই এ সব কর্মের প্রতিক্রিয়ায় বিদ'আতী ও পথভ্রষ্টগণ বিরাট হাঙ্গামার সৃষ্টি করে। এর পাশাপাশি শায়খ মুহাম্মাদ শাসক উছমানের মাধ্যমে জামায়াতের সাথে নামায কায়েমের বিধান চালু করেন। যারা জামায়াতে শরীক না হতো তাদের জন্য শাস্তির বিধান করা হয়েছিল। এ সব কাজের সাথে সাথে তিনি দেশে বিদেশে ধারাবাহিক ভাবে দাওয়াতী চিঠি লেখেন।[২৬]

তৃতীয় পর্যায়ঃ উয়াইনা থেকে বহিষ্কার এবং দারঈয়্যাতে স্থানান্তর (১১৫৭ - ১১৫৮ হিঃ)ঃ

উয়াইনাতে হকের দাওয়াতের কাজ সফলতার সাথেই চলছিল। সংস্কার কর্ম সেখানে অনেকটাই পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। উয়াইনার অধিবাসীগণ শায়খের নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াতকে সহজভাবেই মেনে নিয়েছিল। কিন্তু জনৈক মহিলার উপর তার নিজের স্বীকারোক্তি ও আবেদনের প্রেক্ষিতে রজম কায়েমের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুশমনেরা তাঁর বিরুদ্ধে কঠিন ষড়যন্ত্র করে। বিষয়টি নিয়ে পুরো এলাকায় বিরাট তোলপাড় সৃষ্টি হয়। এমনকি তা অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। আল আহসার দুশ্চরিত্র ও বদ মেজাজী প্রভাবশালী শাসক সোলায়মান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু গারীর বিষয়টি নিয়ে এমন বাড়াবাড়ি করে যে, শায়খকে হত্যা করার জন্যে উয়াইনার আমীর উছমানকে নির্দেশ দেয়। তবে তিনি তাঁকে হত্যা না করে উয়াইনা থেকে অপমান জনক ভাবে বহিষ্কার করেন।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব দারঈয়্যাহর শাসক মুহাম্মাদ ইবনু সউদকে তাঁর কাজের সহযোগী পাবেন মনে করে দারঈয়্যাতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এবং উয়াইনার সীমান্ত পার হয়ে আসরের সময় দারঈয়্যাহ অঞ্চলে পৌছেন। প্রথমে আবদুল্লাহ ইবনু আবদির রহমান আল উরাইনীর বাসভবনে উঠেন। পরে তিনি তাঁর একজন শিষ্য আহমাদ ইবনু সুয়াইলিমের বাড়িতে স্থানান্তরিত হন। শায়খের আগমনের বার্তা শুনে দারঈয়্যার আমীর মুহাম্মাদ ইবনু সউদ তাঁর দুই ভাই মিশারী এবং ছানইয়ানকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হন। এবং তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁর আনুগত্য করা ও তাঁকে সাহায্য করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।[২৭]

আমীর মুহাম্মাদ বিন সউদের (মৃঃ ১১৭৯ হিঃ) সহযোগিতা ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ঃ

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব আহমাদ ইবনু সুয়াইলিমের বাড়িতে অবস্থান করার কারণে এ বাড়িটি তাওহীদ প্রচার ও দাওয়াতের প্রাণ কেন্দ্রে পরিণত হয়।

---

২৫. উছমান ইবনু বিশর, প্রাগুক্ত, খঃ ১, পৃঃ ২২ ও ২৩।
২৬. হুসাইন ইবনু গান্নাম, প্রাগুক্ত, খঃ ১, পৃঃ ২০০।
২৭. প্রাগুক্ত, খঃ ২, পৃঃ ৪ ।

সাধারণ মানুষ বিশেষ করে আলিম উলামা গোপনে শায়খের শিক্ষা ও ইলম থেকে উপকৃত হতে থাকেন। কিন্তু শায়খ মুহাম্মাদ গোপনে হকের দাওয়াতের কাজ পরিচালনার পক্ষে ছিলেন না । তাই তিনি দারঈয়্যার আমীর মুহাম্মাদ ইবনু সউদের সাথে কথা বলার ইচ্ছা করেন এবং তাঁর দুই ভাই মিশারী এবং ছানইয়ানের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তাঁরা দু ভাই বিষয়টি নিয়ে আমীরের স্ত্রী মাওযা বিনতু আবি ওয়াহতানের সঙ্গে কথা বলেন। এই বিদুষী মহিলা ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও ধর্মভীরু। তাঁরা তাঁর কাছে শায়খের ইলম আমল ও আখলাক চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এবং বিষয়টি নিয়ে তাঁকে মুহাম্মাদ ইবনু সউদের সাথে কথা বলার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি তাঁর স্বামী আমীর মুহাম্মাদ ইবনু সউদকে বলেনঃ "এই ব্যক্তি আপনার নিকট আগমন করেছেন। তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে গনীমত মনে করে সম্মানিত করা এবং সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতার হস্ত তাঁর জন্য প্রসারিত করা আপনার কর্তব্য"।[২৮]

মুহাম্মাদ ইবনু সউদ পূর্ব থেকেই উন্নত চরিত্র ও উচ্চ নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। অধিকন্তু শায়খ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব সম্পর্কে স্ত্রীর ইতিবাচক কথায় তাঁর অন্তরে শায়খের প্রতি ভালবাসার সৃষ্টি হয় এবং তিনি অতি সত্বর শায়খের সাথে দেখা করেন। শায়খ তাঁকে উষ্ণ অভিনন্দন জানান এবং তাঁর নিকট প্রকৃত তাওহীদের দাওয়াত তুলে ধরেন। অর্থাৎ কালেমাতুত তাওহীদ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এর অর্থ, সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ এবং জিহাদের দাওয়াত পেশ করেন। তাছাড়া সংক্ষিপ্ত একটি বক্তব্যের মাধ্যমে নজদ বাসীদের মধ্যে যে সব কুসংস্কার, অন্যায় কর্ম এবং সঠিক আকীদাহর পরিপন্থী রসম রেওয়াজের প্রচলন আছে তা হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তুলে ধরেন। এগুলোর সংস্কার ও সংশোধন প্রয়োজন বলে মত ব্যক্ত করেন। শায়খের কথায় মুহাম্মাদ ইবনু সউদ মোহিত হন এবং তাঁকে বলেনঃ হে শায়খ! এটা নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দীন। আপনাকে সাহায্য করা, আপনার নির্দেশ পালন করা এবং তাওহীদের পরিপন্থীদের সঙ্গে জিহাদ করার বিষয়ে আপনাকে আশ্বস্ত করছি। তবে আমার দুটি জানার বিষয় আছে, তা হলোঃ

১) আমরা যদি আপনাকে সাহায্য করি এবং আল্লাহর পথে জিহাদে আপনার সঙ্গী হই, আল্লাহ আপনাকে বিজয় দানের ফলে আপনার দুটি দেশ হয়, আমাদের আশংকা যে আপনি তখন আমাদেরকে ছেড়ে অন্য দেশটিতে চলে যাবেন এবং আমাদেরকে পরিত্যাগ করবেন।

২) দারঈয়্যাহ এলাকার নিয়ম অনুসারে আমি তাদের নিকট থেকে ফসল কাটার সময় খারাজ নিয়ে থাকি, আমার ভয় যে আপনি তা নিতে নিষেধ করবেন।

উত্তরে শায়খ বলেনঃ প্রথম প্রশ্নের প্রেক্ষিতে বলতে চাই যে, আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। আমরা হাতে হাত মিলিয়ে আজীবন এক সাথে থাকার অঙ্গীকার করি।

২৮. ইবনু বিশর, উনওয়ানুল মাজদ, খঃ ১, পৃঃ ১১।

আর দ্বিতীয়টি সম্পর্কে বলতে চাই যে, আল্লাহ পাক আপনাকে অনেক দেশ জয় করার সুযোগ দিলে দারঈয়্যাতে খারাজ হিসাবে যা পান তার চেয়ে অনেক বেশি গনীমতের সম্পদ আল্লাহ আপনাকে দান করবেন।

১১৫৭ কিংবা ১১৫৮ হিজরী সালে আমীর মুহাম্মাদ ইবনু সউদ শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজে বাধা দান এবং আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।[২৯]

এই বাইয়াতের মাধ্যমে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের সংস্কার আন্দোলন রাষ্ট্রীয় ভাবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। ফলে লোকেরা দলে দলে শায়খ মুহাম্মাদের নিকট এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। উয়াইনা থেকে তাঁর প্রাক্তন ছাত্রগণও ছুটে আসেন। তাঁদের মধ্যে সেখানকার শাসক উছমান ইবনু মা'মারের আত্মীয় স্বজনরাও ছিলেন। এমন কি শাসক নিজেও তাঁর পূর্ব আচরণের জন্য শায়খের নিকট অনুশোচনা করে তাঁকে উয়াইনাতে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু শায়খ মুহাম্মাদ বিষয়টি দারঈয়্যার আমীর মুহাম্মাদ ইবনু সউদের উপর ন্যস্ত করেন যে, তিনি যদি সম্মতি দেন তাহলে তাঁর কোন আপত্তি নেই। কিন্তু উছমান ইবনু মা'মারের অনুরোধ সত্ত্বেও মুহাম্মাদ ইবনু সউদ কোন কিছুর বিনিময়েই শায়খকে ছাড়তে ও হারাতে সম্মত হননি।[৩০]

দাওয়াতী যুগের প্রথম কাফিলাঃ

উয়াইনাতে থাকার সময় থেকেই মানুষেরা শায়খ মুহাম্মাদের নিকট ভীড় করতে থাকে। কিন্তু দীর্ঘ দিন তারা বিদ'আতের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকার কারনে সত্য গ্রহণে দ্বিধা দ্বন্দ্বে ছিল। তবে শায়খ যখন দারঈ'য়াতে আসেন এবং মুহাম্মাদ ইবনু সউদ তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন তখন এ যমীনটি দাওয়াতী কাজের জন্য উর্বর ভূমিতে পনিণত হয়। এ সময়ে সমাজের গণ্য মান্য এবং উচ্চ পর্যায়ের লোকদের মধ্যে যারা শায়খের সঠিক দাওয়াত গ্রহণ করে ধন্য হন এবং এ কারণে নানা বিড়ম্বনা ও কষ্টের শিকারে পরিণত হন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মুহাম্মাদ ইবনু সউদের তিন ভাই ছানিয়ান ইবনু সউদ (মৃঃ ১১৮৬ হিঃ), মিশারী ইবনু সউদ (মৃঃ ১১৮৯ হিঃ), এবং ফারহান ইবনু সউদ।[৩১] আলিম উলামার মধ্যে ছিলেন আহমাদ ইবনু সুয়াইলিম ও ঈসা ইবনু কাসেম। সম্মানিত ও প্রভাবশালীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মুহাম্মাদ আলহুযাইমী, আব্দুল্লাহ ইবনু দুগাইছির, সুলায়মান আলউশাইকীরী এবং মুহাম্মাদ ইবনু হুসাইন। এ প্রসঙ্গে মিঃ

২৯. ইবনু বিশর, প্রাগুক্ত, খঃ ১, পৃঃ ১১, ১২।
৩০. মাসউদ নদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪ – ৪৫।
৩১. হুসাইন ইবনু গান্নাম, প্রাগুক্ত, খঃ ১, পৃঃ ৯৪, ১০৫

সেন্ট জন ফিলবী বলেনঃ "উল্লেখিত ব্যক্তি বর্গ ছিলেন ওয়াহহাবী আন্দোলনের দুঃসাহসী অগ্রসৈনিক। যাঁদের নাম এখনো অতি সম্মানের সাথে উল্লেখ করা হয়। এমনকি তাঁদের সন্তানদেরকেও রাজ প্রাসাদে সম্মানের পাত্র হিসাবে গ্রহণ করা হয়"।[৩২]

মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের সংস্কার কর্মঃ

শায়খ মুহাম্মাদের আগমনের পূর্বে দারঈয়া'হ একটি ছোট জনপদ ছিল। চরম মূর্খতার অন্ধকারে সমাজটি ছিল আচ্ছাদিত। শায়খ সেখানে বিদ্যার দ্বার উন্মোচন করেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি লোকদেরকে কুরআন, সুন্নাহ ও এতদসংক্রান্ত জ্ঞান দান করতেন। এ সময় তিনি দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যথা, তাওহীদ, ইবাদাত শুধু আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করা এবং এই বিশ্বাস ও কর্মকে মানুষের মনের মধ্যে বদ্ধমূল করার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং সত্য ও নিষ্ঠাপূর্ণ দাওয়াতের প্রভাব খুব শীঘ্রই প্রকাশ হতে শুরু করে। তাঁর ওয়াজ ও নসীহতের ফলে মানুষের মানস পটে জমে থাকা অন্ধকার তথা "পিতা মাতাকে যে প্রথার উপর পেয়েছি" এই মূর্খতার কালো মেঘ ক্রমশঃ কেটে যেতে থাকে। এবং লোকেরা ঐ সময় অন্ধ অনুকরণ এবং আদত অভ্যাসগুলোকে শুধু পবিত্র কুরআন ও সুন্নাতের মানদণ্ডে নির্ণয় করতে শুরু করে। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী যে কোন তাকলীদ ও কৃষ্টি কালচারকে প্রত্যাখান করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে।

আকর্ষণীয় এ সব ইলমী মাজলিস ও ধর্মীয় বৈঠকাদির দরুন দারঈয়্যাহ অঞ্চলের বাইরের অনেক দূর দূরান্ত থেকেও ইলম ও জ্ঞান পিপাসুরা শায়খের নিকট জড়ো হতে থাকে। কিন্তু অর্থ সংকটের কারণে এ সকল ছাত্রদেরকে বিভিন্ন কাজ কর্ম করে জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা নিজেদেরকেই করতে হয়। এ জন্যে তাঁরা রাতের বেলা জীবিকা উপার্জন করতেন। আর দিনের বেলা আল্লাহর কিতাব ও রাসূল মুস্তাফার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীছ শোনার জন্যে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখেন। বহুসংখ্যক ছাত্রের সমাগম এবং তাদের মেহমানদারীর কারণে শায়খ সব সময় অভাবগ্রস্ত ও ঋণগ্রস্ত থাকতেন। তবে দাওয়াতী কাজের প্রচার ও প্রসার ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে থাকে। ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে আগন্তুকদের সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

দাওয়াতী কাজের লক্ষ্য ঃ

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের দাওয়াতী কাজের লক্ষ্য ছিলোঃ

(ক) ইসলামী আকীদাহ বিশ্বাসে যে সব শিরক, বিদ'আত এবং অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে তা থেকে মুক্ত করে মুসলিমদেরকে সঠিক আকীদাহর অনুসারী করা।

---

৩২. ST. J. Philby, Arabia, পৃঃ ১২, ১৩।

(খ) ইসলামের যাবতীয় হুকুম আহকাম ও দন্ডবিধি সহ ইসলামী কৃষ্টি কালচার চালু করার মাধ্যমে মুসলিমদেরকে আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সময়ের ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করানো।

(গ) পরিপূর্ণ ইসলামী সমাজ কায়েম করা। যে সমাজের মুসলিম জনগোষ্ঠী ইসলামকে আকীদাহ, ইবাদাত, শরীয়াত এবং একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসাবে বিশ্বাস করবে এবং ইসলামী শরী'য়াহ ও নীতিমালা অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করবে।

দাওয়াতী কাজের লক্ষ্যসমূহের উপর একটি বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনাঃ

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের দাওয়াত ও সংস্কারধর্মী কার্যকলাপের প্রকৃত লক্ষ্য ও মূল রহস্য কি তা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার দাবী রাখে। কেননা এ ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিকদের নানা মত লক্ষ্য করা যায়। যা অনেক পাঠকের মধ্যে বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে। বস্তুতঃ আমি নিজেও কোন কোন বিজ্ঞ লোকের মধ্যেও বিভ্রান্তি মূলক বিশ্বাস ও এর আলোকে এই আন্দোলন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করতে শুনেছি। শায়খ মুহাম্মাদের দাওয়াতী কাজের লক্ষ্য নিয়ে তিন ধরণের মত পাওয়া যায়, সেগুলো হলোঃ

১) তাঁর দাওয়াতী কাজ নিছক একটি ধর্মীয় সংস্কারমূলক আন্দোলন। এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হলো দীর্ঘ কাল ধরে ইসলামী আকীদাহ বিশ্বাসে শিরক ও বিদ'আতের যে ছোঁয়া লেগেছে তা থেকে ইসলামী আকীদাহকে পবিত্র করা।

২) কারো মতে এটি একটি রাজনৈতিক আন্দোলন। রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির লক্ষ্যে ধর্মীয় সংস্কারকে ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আরব উপসাগরীয় অঞ্চলে উছমানী খিলাফতের বিপরীতে স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই ছিল মূল লক্ষ্য। এ আন্দোলনের পেছনে ইংরেজদের হাত ছিল বলেও তারা মনে করেন ।

৩) কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, এটি একটি ধর্মীয়-রাজনৈতিক আন্দোলন। এ আন্দোলনের মাধ্যমে ধর্মীয় সংস্কারের সাথে সাথে পৃথক একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা বাস্তবে উছমানী খিলাফত থেকে পৃথক ছিল[৩৩]।

তৃতীয় এ মতটি এই আন্দোলনের প্রকৃত লক্ষ্য মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সত্যের কাছাকাছি মনে হলেও এ মতটি অতি সূক্ষ্ম সংশয়পূর্ণ ও একটি ভ্রান্ত চিন্তার ফসল। তাহলো দীন ইসলামকে রাষ্ট্র ও জীবন থেকে পৃথক মনে করা। আধুনিক পরিভাষায় যার নাম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। মুসলিম বিশ্বের সকল ঘটনা প্রবাহকে ইসলাম বিদ্বেষী পশ্চিমা জগত এ মানদন্ড দিয়েই মূল্যায়ন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রকৃত ও আসল বিষয় হলো যে, শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের সংস্কার আন্দোলন একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন। এর মাধ্যমে ইসলামকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও খুলাফায়ে রাশিদূনের যুগের অনুরূপ এর প্রকৃত অবয়বে তুলে ধরা হয়েছে। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে ইসলামকে মানব জীবনের ধর্মীয়, সামাজিক,

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিচার, সংস্কৃতি, কৃষ্টি কালচার ইত্যাদির ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ইসলামে ধর্মীয় আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলন নামে বিভাজন করার কোন সুযোগ নেই। সুতরাং এই আন্দোলন ছিল মূল ইসলামের দিকে মুসলিম জাতিকে ফিরিয়ে আনার আন্দোলন। যে ইসলামের উপর প্রথম যুগের মুসলিমগণ প্রতিষ্ঠিত থেকে সমস্ত বিশ্বকে পরিচালনা করেছেন। যে ইসলাম দ্বারা গোটা পৃথিবীর নেতৃত্ব মুসলিমগণ দিয়েছেন। এ বিষয়টির মাধ্যমে মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের সংস্কার আন্দোলনের লক্ষ্য উছমানী খিলাফাতের বিপরীতে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার যে বিভ্রান্তি রয়েছে তার নিরসন হবে। বস্তুতঃ উছমানী শাসকগণ যদি শায়খ মুহাম্মাদের আন্দোলনের বৈরী ও হিংসুক লোকদের দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে এ আন্দোলনের সহযোগিতা করতেন তাহলে এ ভুল বুঝাবুঝির সুযোগ সৃষ্টি হতোনা। মুসলিম খিলাফাত হয়তো আরো সুসংহত হতে পারতো।

দাওয়াত ও সংস্কারমূলক কাজের উৎসঃ

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের দাওয়াত ও সংস্কারমূলক কাজের মূল উৎস ছিলঃ

একঃ কুরআন কারীমঃ বস্তুতঃ কুরআন কারীম হলো ইসলামী শরীয়াতের প্রথম উৎস। শায়খ মুহাম্মাদ তাঁর দাওয়াতী কাজে কুরআন কারীমকেই প্রথম ও প্রধান উৎস হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি দশ বছর বয়সেই কুরআন হিফয করেন। তাঁর লিখিত কিতাবাদিতে কুরআনের প্রতি শায়খের গুরুত্ব কতটুকুন ছিল তার বাস্তব প্রমাণ মেলে। প্রতিটি কথা ও মতের স্বপক্ষে শায়খ কুরআনের বা হাদীছে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদ্বৃতি উপস্থাপন করেছেন। তাঁর লিখিত "উসূলুল ঈমান" বইটিতে তিনি একটি অনুচ্ছেদের নাম দিয়েছেন আল ওসিয়্যাতু বিকিতাবিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে ওসিয়াত। তাছাড়া কুরআনের প্রতি শায়খের বিশ্বাস সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে আল কাসীম এলাকার লোকদের উদ্দেশ্যে লেখা এক পত্রে তিনি বলেনঃ " আমি বিশ্বাস করি আল কুরআন আল্লাহর কালাম। কুরআন সৃষ্ট বস্তু নয়। আল্লাহর নিকট থেকেই নাযিল হয়েছে, তাঁর নিকটে প্রত্যাবর্তন করবে। প্রকৃত অর্থেই কুরআনের কথা আল্লাহর কথা। রূপক কথা নয়। তিনি তা তাঁর বান্দা, রাসূল, যিনি তাঁর ও তাঁর বান্দাদের মাঝে বিশ্বস্ত প্রতিনিধি, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর নাযিল করেছেন"।[৩৩]

দুই. সুন্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত হলো ইসলামী শরীয়াতের দ্বিতীয় উৎস। শায়খ মুহাম্মাদ ছোট কাল থেকেই যেমন কুরআন হিফয করা ও স্টাডি করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন একইভাবে সুন্নাতে রাসূলের অধ্যয়নের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাঁর লিখিত বই পুস্তকে

৩৩. মুহাম্মাদ ইবনু সোলায়মান আল সালমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬ – ৩৭।

কুরআন কারীমের আয়াতের উদ্ধৃতির পাশাপাশি সুন্নাতে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদ্ধৃতিও প্রচুর পরিমাণ রয়েছে। পূর্বোল্লেখিত বইতে তিনি কুরআনের মতোই "সুন্নাতে রাসূলকে আঁকড়ে ধরার প্রতি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উৎসাহ প্রদান" নামক একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন[৩৪]। দাওয়াতী কাজে সুন্নাতে রাসূলের প্রতি তাঁর গুরুত্ব প্রদানের আরো প্রমাণ হলো তিনি পাঠকদের সুবিধার্থে সহীহ আল বুখারীর প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা "ফাতহুল বারী" এবং "সীরাতে ইবনে হিশাম" কিতাবদ্বয়ের সার সংক্ষেপ রচনা করেন।

তিন. আছার আল সালাফঃ শায়খ মুহাম্মাদ ইসলামের মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহর পাশাপাশি আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক সনদ প্রাপ্ত সালফে সালিহীন অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন এবং তাবে' তাবিঈন থেকে প্রাপ্ত সহীহ আছার সমূহের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। বিশেষ করে প্রসিদ্ধ চারজন ইমামঃ ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ' এবং ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল। তাঁর পুস্তাকাদি ও লেখনীতে তাঁর কোন মতামতের স্বপক্ষে এ ইমামদের প্রচুর উদ্বৃতি রয়েছে। বিশেষ করে তিনি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (মৃঃ ২৪১ হিঃ), ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (মৃঃ ৭২৮ হিঃ) এবং ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আল কাইয়্যেম (মৃঃ ৭৫১ হিঃ) দ্বারা খুব বেশি প্রভাবান্বিত ছিলেন। যার স্বাক্ষর তাঁর দাওয়াতী কর্মসূচী, চিন্তা চেতনা, মতামত ও পুস্তকাদিতে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। এ ভাবেই শায়খ মুহাম্মাদ তাঁর দাওয়াত ও সংস্কারমূলক কর্ম ইসলামের মূল ও স্বচ্ছ উৎসসমূহ থেকে গ্রহণ করেছেন। নিছক মানবীয় চিন্তা, দর্শন এবং যুক্তির উপর নির্ভর করে পরিচালনা করেননি। কেননা যুক্তি ও আকল ভুল ত্রুটির উর্ধে নয়। তবে আকলকে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ নিঃসৃত বিষয়াবলীকে সমর্থনের জন্য ব্যবহার করা অপরিহার্য।

দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের মৌলিক কর্মসূচীঃ

শায়খ মুহাম্মাদের সংস্কার আন্দোলনের ঐ সকল মৌলিক কর্মসূচী এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যেগুলো নিয়ে তাঁর সাথে সমকালীন আলিম উলামা দ্বিমত পোষণ করেছেন এবং বিরোধিতার প্রচন্ড ঝড় তুলেছেন। সেগুলোকে মোটামুটি সাতটি মাসআলা আকারে পেশ করা যায়। যেমনঃ

একঃ তাওহীদঃ

তাওহীদের সংজ্ঞায় শায়খ মুহাম্মাদ বলেনঃ

"هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده".

"তাওহীদ হলো ঃ সকল প্রকার ইবাদাতকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার জন্য একক ভাবে নির্দিষ্ট করা। এই তাওহীদ হলো আল্লাহর বান্দাদের নিকট আগত

রাসূলগণের দীন"।[৩৪] শায়খ মুহাম্মাদের পৌত্র এবং বিশিষ্ট ছাত্র শায়খ আব্দুর রহমান ইবনু হাসান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব তাওহীদকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেনঃ

(১) তাওহীদ আল রুবুবিয়্যাহঃ অর্থাৎ আল্লাহর কর্মে আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান করা। যেমনঃ সৃষ্টি, রিযক দান, জীবন দেয়া, মৃত্যু দেয়া, বৃষ্টি দেয়া, বায়ু পরিচালনা করা ইত্যাদি। এই প্রকারের তাওহীদের স্বীকৃতি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগের কাফিরগণও প্রদান করতো। কিন্তু এই বিশ্বাসের কারণে তারা মুসলিম বলে স্বীকৃত হয়নি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

অর্থাৎ আপনি বলুন! আসমান ও যমীন থেকে তোমাদেরকে কে রিযক দান করেন? কান ও চোখের মালিক কে? মৃত থেকে জীবিতকে এবং জীবিত থেকে মৃতকে কে সৃষ্টি করেন? সকল কাজের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কে করেন? তারা অতি সত্বর জবাব দেবে ঃ আল্লাহ। অতপর আপনি বলুনঃ তারপরও কি তোমরা ভয় করবে না?" (ইউনুসঃ ৩১)

(২) তাওহীদ আল উলুহিয়্যাহঃ অর্থাৎ মানুষের সকল প্রকার ইবাদাতে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দেয়া। সকল প্রকার ইবাদাতের তিনিই একমাত্র হকদার। যেমনঃ দু'আ, নযর, সাহায্য চাওয়া, ফরিয়াদ করা, ভরসা করা ইত্যাদি। এই প্রকারের তাওহীদকেই সকল যুগের কাফির ও মুশরিকগণ অস্বীকার করেছে। এ বিষয় নিয়েই সকল যুগেই নবী ও রাসূলগণ এবং সমকালীন কুফরী শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে।

(৩) তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাত ঃ অর্থাৎ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান করা। পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহতে আল্লাহর যত নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করা হয়েছে সেগুলোকে কোন প্রকার ধরণ, উপমা, ব্যাখ্যা, পরিবর্তন কিংবা অকেজো করা ছাড়াই হুবহু সেগুলোকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা এবং এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, কোন কিছুই আল্লাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ শ্রবনকারী, দ্রষ্টা।[৩৫]

বস্তুতঃ শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব ও তাঁর অনুসারী আলিমগণ আল্লাহর রুবুবিয়্যাত ও তাঁর উলুহিয়্যাতের দাওয়াতের উপর সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

---

৩৪. মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব, কাশফুশ শুবহাত, (আততাওহীদ আন নাজদিয়্যাহ) পৃঃ ৬৯।

৩৫. মুহাম্মাদ ইবনু সোলায়মান আল সালমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১ – ৪২।

তাই শায়খের সকল লেখনীর বিশাল অংশ জুড়েই ইবাদাতে আল্লাহর একত্ববাদ বিষয়টির আলোচনা স্থান পেয়েছে। তাওহীদের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতে গিয়েই শায়খ মুহাম্মাদ "কিতাবুত তাওহীদ" নামে স্বতন্ত্র একটি বই রচনা করেছেন, যা সর্বমহলে পরিচিত ও সর্বত্র প্রসিদ্ধ। এই বইটিতে প্রথমেই তিনি ইবাদাতের গুরুত্ব, তাওহীদের অর্থ, "শাহাদাতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর" অর্থ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তারপর 'বিদ'আত', এর ক্ষতিকর ও ভ্রান্ত দিক তুলে ধরেছেন। তিনি পরিষ্কার করেছেন যে, বিদ'আতগুলোর মধ্যে কিছু কিছু রয়েছে শিরক কর্মকাণ্ড। আর কিছু আছে শিরকের উসীলা বা বাহন। যেমনঃ বিপদ মুসীবত দূর করার নিমিত্তে সুতা ও বালা পরিধান করা, তাবিজ তুমার, গাছ, পাথর ইত্যাদির নিকট বরকত হাসিল করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবাই করা, সাহায্য প্রার্থনা করা, অন্যের নিকট ফরিয়াদ করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা, সৎ ও নেক বান্দাদের ব্যাপারে অতিরঞ্জনে বিশ্বাস পোষণ করা।[৩৬]

দুইঃ শাফায়া'ত ঃ

শায়খ মুহাম্মাদ শাফা'য়াতকে দু ভাগে ভাগ করেছেন।

একঃ কুরআন কারীমে যে শাফা'য়াতকে অস্বীকার করা হয়েছে । যেমনঃ কাফির ও মুশরিকদের জন্য শাফা'য়াত কোন উপকারে আসবে না। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ

অর্থাৎ "সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের (কাফির ও মুশরিক) কোন উপকারে আসবে না" (আল মুদ্দাছ্‌ছিরঃ ৪৮)।

দুইঃ কুরআন মাজীদ যে শাফা'য়াতকে সাব্যস্ত করেছে, এই শাফা'য়াত কেবল তাওহীদপন্থীদের জন্য নির্দিষ্ট। এই প্রকার শাফায়া'তের জন্যও দুটি শর্ত রয়েছেঃ

(১) সুপারিশকারীর জন্য সুপারিশ করার আল্লাহর অনুমতি। মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ

مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

অর্থাৎ " আল্লাহর অনুমতি ব্যতিত কে তাঁর নিকট সুপারিশ করতে সক্ষম হবে? "(আল বাকারাহঃ ২৫৫)

(২) সুপারিশ প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি সুপারিশ করার জন্য আল্লাহর অনুমতি। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

وَلاَ يَشْفَعُوْنَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضٰى

অর্থাৎ "আল্লাহ যার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন তিনি ছাড়া সুপারিশকারীগণ অন্য কারো জন্য

---

৩৬. মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব, কিতাবুত তাওহীদ।

সুপারিশ করতে পারবেন না"। (আল আম্বিয়াঃ ২৮)। কুরআন কারীম ও সহীহ সুন্নাহতে যারা সুপারিশ করতে পারবেন বলে প্রমাণিত শায়খ মুহাম্মাদ তাদের সুপারিশের কথা স্বীকার করেছেন। যেমনঃ নবী রাসূলগণ, ফেরেস্তাগণ, আল্লাহর ওলীগণ এবং শিশুরা। তবে এদের নিকট থেকে সুপারিশ পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। এই ব্যক্তিদের নিকট প্রার্থনা করা বৈধ নয়।[৩৭]

তিনঃ কবর যিয়ারত এবং কবরের উপর ইমারত নির্মাণঃ

বস্তুতঃ এ বিষয়টি নিয়ে শায়খ মুহাম্মাদ ও তাঁর দাওয়াতের অনুসারী আলিমগণের সঙ্গে তাঁদের শত্রুদের তুমুল মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। তবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ এই যুগে মুসলিম বিশ্বে বিকৃতির অধিকাংশ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল মূর্খ মুসলিমগণ কর্তৃক নেক লোকদের কবরকে অসাধারণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মধ্য দিয়েই। তারা সেখানে তাদের ইবাদাত বন্দেগী বা এর কাছাকাছি কার্যক্রম পরিচালনা করতো । শায়খ মুহাম্মাদ এই শিরকী কার্যকলাপ নিরসন করার চেষ্টা করেন। এবং তাঁর লিখিত প্রায় সব বই পুস্তকেই বিষয়টি উত্থাপন করে শক্তভাবে এর ভ্রান্ত দিক তুলে ধরেন। তিনি তাঁর লিখিত প্রসিদ্ধ পুস্তক "কিতাবুত তাওহীদে" একাধারে কবর যিয়ারত ও কবরকেন্দ্রিক আকীদাহবিরোধী কার্যকলাপগুলো তুলে ধরেন। একটি পরিচ্ছেদে তিনি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন যে, বনী আদমের মধ্যে সর্ব প্রথম নূহ (আ) এর সময়ে কুফরীর প্রচলন হয় নেক বান্দাদের কবর নিয়ে অতিরঞ্জিত কার্যকলাপ করার মাধ্যমে। তারপরের অনুচ্ছেদে তিনি সৎ ব্যক্তির কবরের পাশে আল্লাহর ইবাদাতকারীর প্রতি কী কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে তা তুলে ধরেন। তাহলে সরাসরি কবর পূজা করলে কী হবে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তৃতীয় অনুচ্ছেদে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাওহীদের হিফাযতের জন্যই (لا تتخذوا قبري عيدًا) "তোমরা আমার কবরকে ঈদ বানিয়ো না" (আবু দাউদ উত্তম সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন) উল্লেখ করেছেন।[৩৮] তিনি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন যে, মুসলিম সমাজের কতিপয় লোক আল্লাহর ওলীদের কবরগুলোতে যা করছে তা সুস্পষ্ট তাওহীদ আল উলুহিয়্যার বিপরীত। কাফিরগণ যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে লাত ও উয্যা ইত্যাদির ইবাদাত করতো অনুরূপভাবে এই সব মুসলিমও একই উদ্দেশ্য নিয়েই ওলীদের কবর পূজা করে থাকে।[৩৯]

এ কারণে শায়খ মুহাম্মাদ শর'য়ী কবর যিয়ারতের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন যা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক অনুমোদিত। অপরদিকে বিদ'আতী ও শিরকী কবর যিয়ারতকে নিষিদ্ধ করেন। তাই তিনটি মসজিদ ছাড়া বরকত ও সাওয়াব

---

৩৭. মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫, এবং মুহাম্মাদ বিন সোলায়মান আল সালমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫।

৩৮. মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯ – ৪৬।

৩৯. মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব, কাশফুশ শুবহাত, পৃঃ ১২০।

হাসিলের উদ্দেশ্যে কোন কবর যিয়ারতের জন্য যাওয়া নিষিদ্ধ। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেনঃ

" لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إلى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ، الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الأقْصَى ".

"তিনটি মসজিদ ব্যতিত (সাওয়াবের উদ্দেশ্যে) সফরে বের হওয়া যাবেনা। মসজিদ তিনটি হলোঃ আল মাসজিদুল হারাম বা পবিত্র কা'বা, আমার মসজিদ বা মসজিদে নববী আর আল মাসজিদুল আকসা"। (সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম) তাছাড়া আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলীকে (রা) উঁচু কবর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (সহীহ মুসলিম) তাই শায়খ মুহাম্মাদ যায়িদ ইবনু খাত্তাবের (রা) কবরের উপর নির্মিত গম্বুজ ভেঙ্গে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর অনুসারীগণও অনেক কবরের উপর নির্মিত গম্বুজ ভেঙ্গে ফেলেছিলেন।[৪০]

চারঃ বিদ'আত এর বিরুদ্ধে অবস্থানঃ

শায়খ মুহাম্মাদ তাঁর দাওয়াতী ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের সূচনা লগ্ন থেকেই বিদ'আতের বিরুদ্ধে সার্বিক লড়াই শুরু করেন। এ জন্যে তিনি তাঁর ছাত্র ও অনুসারীদেরকে "দালাইল আল খায়রাত" ও রাওদু আল রিয়াহীন"[৪১] নামক দুটি বই পড়তে নিষেধ করেন। কারণ এ দুটি পুস্তকে প্রচুর বিদ'আতের বর্ণনা আছে। যা পাঠককে বিদ'আতের দিকে অনুপ্রাণিত করে। উল্লেখযোগ্য বিদ'আতের মধ্যে ঈদে মিলাদুন্নবী এবং ভন্ড সূফীবাদ শামিল। এগুলোকে শায়খ মুহাম্মাদ দীনের মধ্যে ইবাদাতের নামে নতুন আবিষ্কার যা কুরআন কারীম ও সুন্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সাহাবীগণ কর্তৃক সমর্থিত নয় বলে চিহ্নিত করেন। অথচ আল্লাহর নবীর সাহাবীগণ রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বাধিক ভালবাসতেন। শায়খ শুরু থেকেই ভন্ড সূফীদের বিরুদ্ধে ছিলেন। এ কারণে তাঁকে বহিষ্কৃতও করা হয়। এবং নিজ এলাকা নজদেও তিনি নানা যুল্ম নির্যাতনের শিকার হন। তিনি ভন্ড সূফীদের কার্যকলাপকে এ ভাবে চিত্রায়িত করেন যে,

" الذين يَأكُلونَ أموَالَ النَّاس بالبَاطِل، يَأمُرونَ النَّاسَ أنْ يُنْذِرُوا لَهُمْ وَيَنْخونَهُمْ ويَنْدِبُونَهُمْ ".

"তারা মানুষের সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করে। মানুষদেরকে তাদের উদ্দেশ্যে নযর নিয়ায দিতে নির্দেশ দেয় এবং তাদের নিকট প্রার্থনা করতে বলে ও তাদেরকে ডাকতে

৪০. মুহাম্মাদ ইবনু সোলায়মান আল সালমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯।

৪১. দালাইল আল খায়রাত বইটির লেখক হলেনঃ মুহাম্মাদ ইবনু সোলায়মান আল জাযুলী। আর "রাওযুর রিয়াহীন " বইটির লেখক হলেনঃ আব্দুলাহ ইবনু আসআদ আল ইয়াফিয়ী'।

বলে"।[৪২] তবে শায়খ মুহাম্মাদ আল্লাহর ওলীদের কারামতকে স্বীকার করতেন, তিনি আলকাসীমের জনগণের উদ্দেশ্যে লেখা এক পত্রে বলেনঃ

" وَأُقِرُّ بِكَرَامَاتِ الأَوْلِيَاءِ وَمَا لَهُمْ مِنَ المُكَاشَفَاتِ إِلاَّ أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَحِقُّونَ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى شَيْئاً، وَلاَ يُطْلَبُ مِنْهُمْ مَا لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهُ ".

"আমি ওলীদের কারামতকে স্বীকার করি। তাছাড়া তাঁদের যে কাশফ হতে পারে তাও বিশ্বাস করি। তবে তাঁরা আল্লাহর হক থেকে কিছু পাওয়ার অধিকার রাখেন না। তাঁদের নিকট এমন কিছু প্রার্থনা করা যাবেনা, যা পূরণ করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়া'লার"।[৪৩]

পাঁচঃ সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজে নিষেধ করাঃ

শায়খ মুহাম্মাদ কর্তৃক পরিচালিত সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট হলো এই দাওয়াতের মাঝে এবং ইসলামের বিধি বিধানকে কার্যকর করার মধ্যে কোন প্রকার অসঙ্গতি নেই। বরং দাওয়াত ও বাস্তবায়ন এই দাওয়াতী আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট। এ কারণেই শায়খ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের মৌলিক কর্মসূচী ও নীতিমালার একটি হলো এর অনুসারীদেরকে সৎ কর্মগুলোর বাস্তবায়ন এবং অসৎ ও অন্যায় কর্মকান্ডগুলোকে পরিহার করার প্রতি তাকীদ করা। এবং এ কাজটি যে ইসলামী সমাজের প্রতিটি নাগরিকের তার ক্ষমতা অনুযায়ী অপরিহার্য, তা ভালভাবে বুঝিয়ে দেয়া। ইসলামী পরিভাষায় এ কর্মটিকে "সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ" বা " আল হিসবাহ" বলা হয়।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব ইসলামী শরীয়াতের নীতিমালার আলোকে যার যার ক্ষমতা অনুযায়ী এ কাজটি করাকে ওয়াজিব মনে করেন।[৪৪] কেননা আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সহীহ হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

" مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ ".

"তোমাদের কেউ যদি কোন অন্যায় কাজ দেখে সে যেন তার শক্তি দিয়ে তা অবশ্যই প্রতিহত করে। শক্তি দিয়ে সম্ভব না হলে তা মুখ দিয়ে প্রতিবাদের মাধ্যমে পরিবর্তন করে। তাও সম্ভব না হলে মনে মনে সে কাজটিকে প্রত্যাখ্যান করে। আর এটা দুর্বলতম ঈমানের লক্ষণ"। (সহীহ মুসলিম)

---

৪২. হুসাইন ইবনু গান্নাম, তারিখে নাজদ, পৃঃ ৫৪০।

৪৩. মুহাম্মাদ ইবনু সোলায়মান আল সালমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫।

৪৪. আব্দুর রহমান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু কাসিম, আল দুরার আল সিনিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৭।

ইসলামী শরীয়াতে 'সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ' একটি অপরিহার্য বিধান। এটি শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব প্রথম আবিষ্কার করেছেন এমন নয়, বরং এ কাজটি ইসলামের একটি মৌলিক বিধান। অতীতে ইসলামী রাষ্ট্রে সরকারী ভাবেই "আল হিসবাহ" নামক একটি বিভাগ ছিল। যার প্রধানকে "আল মুহতাসিব" বলা হতো। এ বিভাগের মূল দায়িত্ব ছিল 'সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ'। এ বিভাগের প্রধানকে সহযোগিতা করার জন্য আরো কিছু সংখ্যক জনশক্তি কর্মরত থাকতো। এই বিভাগ নিয়মিতভাবে সাধারণ জনগণের কর্মকান্ড, আখলাক চরিত্র, ব্যবসা বানিজ্য, বিভিন্ন পেশাজীবীর কার্যকলাপ, বাজার মূল্য, ওজন ইত্যাদি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং করতো।[৪৫]

শায়খ মুহাম্মাদের দাওয়াতী কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের ইবাদাত এবং আখলাক চরিত্রের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হতো। তাদেরকে জুম'আর নামায এবং জামা'য়াতের সাথে নামায আদায়ের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হতো । মাহে রমাযানের পবিত্রতা রক্ষার্থে দিনে পানাহার নিষেধ করা হতো। তাছাড়া সামাজিক অবক্ষয় রোধে মদ পান, গান বাজনা, বাজে খেলাধুলা এবং প্রকাশ্যে গুনাহ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন করতো।

এর ধারাবাহিকতায় বর্তমান সময় পর্যন্ত সউদী আরবে সরকারীভাবে 'সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ বিভাগ' নামে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ রয়েছে, যে বিভাগ 'সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ' এর মাধ্যমে জনগণকে সামাজিক অবক্ষয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী সকল অপতৎপরতা রোধ করে এবং আইনগতভাবে তা প্রতিহত করে।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব সমাজের ঐক্য ও মুসলিম উম্মাহর সংহতি রক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েই 'সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ' কাজটিকে ধৈর্যের সাথে করার নীতি অবলম্বন করেন। তাই অন্যায় কাজ প্রতিরোধে প্রথমে ব্যক্তিকে গোপনে নসীহত করা, তা নাহলে তার উপর যার প্রভাব আছে তার মাধ্যমে নসীহতের ব্যবস্থা করা। তাতেও কাজ না হলে প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা করার কথা বলেন। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি গভর্ণর বা শাসক হয় তাহলে তার উপরের কর্তা ব্যক্তির মাধ্যমে সংশোধনের চেষ্টা করা। যাতে করে সমাজের মধ্যে ঐক্যের ক্ষেত্রে কোন বিরূপ ধারার সৃষ্টির সুযোগ না হয় এবং মুসলিম সমাজ বিপর্যয়ের মুখে না পড়ে।[৪৬]

---

৪৫. মুনীর আল আজলানী, তারীখুল বিলাদ আল আরাবিয়্যাহ আল সউদিয়্যাহ, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৮১, ২৮২।

৪৬. হুসাইন ইবনু গান্নাম, প্রাগুক্ত, খঃ ১, পৃঃ ৪১১, ৪১২।

ছয় ঃ কাফির ঘোষণা এবং যুদ্ধ করার নীতিমালা ঃ

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব তাঁর দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারের জন্য নানা পদ্ধতি ও উপায় অবলম্বন করেন। দাওয়াতকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে তিনি নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করেনঃ (১) ওয়াজ, নসীহত এবং পাঠ দান কর্মসূচীঃ দাওয়াতের মূল কর্মসূচী, নীতিমালা ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য শিক্ষার্থী ও ছাত্রদের নিকট তুলে ধরার জন্য প্রতিদিন একাধিক শিক্ষা বৈঠক পরিচালনা করতেন। (২) বক্তৃতা ও বিবৃতিঃ বিভিন্ন সভা সমাবেশে বক্তৃতার মাধ্যমে সাধারণ জনগণের নিকট দাওয়াতের কর্মসূচী পেশ করতেন । (৩) চিঠি পত্রঃ বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে খ্যাতিমান, প্রভাবশালী এবং প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের নিকট চিঠি পত্রের মাধ্যমে নিজের দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলন পেশ করতেন এবং তাদেরকে এই তাওহীদবাদী দাওয়াতের ছায়াতলে আসার জন্য আহবান জানাতেন। অপরদিকে তাঁর এবং তাঁর দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলন ঘিরে শত্রুদের কথিত অভিযোগ ও অপবাদের জবাবও এ সকল চিঠি পত্রের মাধ্যমে দিতেন। (৪) বাহাছ, মুনাযারা, যুক্তি তর্ক ও সংলাপঃ বিভিন্ন অঞ্চলের আলিম উলামা ও ইসলামী বিশেষজ্ঞদের সাথে তাঁর দাওয়াত ও মতামত নিয়ে যুক্তিতর্ক ও সংলাপের মাধ্যমেও তিনি দাওয়াত পেশ করতেন। (৫) পুস্তকাদি রচনাঃ শায়খ তার দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলন, নীতি আদর্শ, কর্মসূচী, কর্ম কৌশল, লক্ষ্য উদ্দেশ্য, দাওয়াতের প্রকৃত স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়গুলোকে সুস্পষ্ট রূপে তুলে ধরার জন্য বহু বই পুস্তক রচনা করেন। এ সকল পদ্ধতিগুলোর কোনটাই যখন কাজে না আসে তখন চূড়ান্ত পদ্ধতি হিসাবে কিতালকে বেছে নেয়ার কথা বলেন।[৪৭] বস্তুতঃ শায়খ মুহাম্মাদ তাঁর দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ে দারঈয়্যাতে পৌছার দুবছর পর রাষ্ট্র শক্তির সহযোগিতায় কিতালের আশ্রয় নেন। এর আগে তিনি পূর্বে উল্লেখিত পদ্ধতিগুলিই অনুসরণ করেছেন।

তাছাড়া শায়খ মুহাম্মাদ কিতাল বা সশস্ত্র লড়াই সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলেনঃ

وَأَمَّا القِتالُ فَلَمْ نُقاتِلْ أَحَدًا إِلَى الْيَوْمِ إِلاَّ دُونَ النَّفْسِ وَالْحُرْمَةِ، وهُمُ الذِينَ أَتَوْنا فِي دِيارِنَا وَلاَ أَبْقَوْا مُمْكِناً، ولكنْ قَدْ نُقاتِلُ بَعْضَهُمْ عَلى سَبِيلِ الْمُقابَلَة { وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا } وَكَذلِكَ مَنْ جَاهَرَ بِسَبِّ دِينِ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بَعْدَما عَرَفَه".

"আর লড়াই বা যুদ্ধ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো যে, আমরা আমাদের জান ও ইজ্জত আবরুর হিফাযত ব্যতিত এখন পর্যন্ত কারো সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হইনি। যারা আমাদের দেশে এসেছে এবং স্থায়ী ভাবে থাকেনা তাদের সাথেও লড়াই করি না। তবে তাদের

৪৭. কামাল সাইয়্যেদ দরোবীশ, মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব এবং ওয়াহহাবী দাওয়াত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০ – ৭৫।

কারো কারো সাথে প্রতিশোধের ভিত্তিতে, (যেমনঃ আল্লাহর বাণী)" খারাপের পরিণতি অনুরূপ খারাপই হয়" (আশ্ শূরাঃ ৪০) আমরা যুদ্ধ করতে পারি। একইভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দীন ভালভাবে জানার পর স্পষ্টভাবে গাল মন্দ করে তার বিরুদ্ধেও লড়াতে পারি "।[৪৮]

অপরদিকে শায়খ মুহাম্মাদ কাফির ঘোষণার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নীতিমালার অনুসরণ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর লিখিত একটি পত্রে চার ধরণের লোকদেরকে কাফির হিসাবে ঘোষণার উপযুক্ত বলে মনে করেন। তিনি বলেনঃ

১) যে ব্যক্তি তাওহীদ জেনে বুঝে তা এড়িয়ে যায়। তাওহীদ মানেনা, শিরক করা ছেড়ে দেয় না। সে কাফির হবে।

২) যে ব্যক্তি তাওহীদ ও শিরক ভালভাবেই বুঝে, কিন্তু আল্লাহর দীনকে গালি দেয় এবং মুশরিকদের স্তুতি গায়, সে ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির চেয়ে আরো মারাত্মক কাফির।

৩) যে ব্যক্তি তাওহীদ জানে ও মানে এবং শিরকও চেনে এবং তা পরিহার করে। তবে সে কারো তাওহীদে বিশ্বাসী হয়ে ইসলামে প্রবেশ করাকে অপছন্দ করে এবং যে শিরক অবস্থায় থাকে তাকে ভাল জানে, সেও কাফির। কেননা আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করেনঃ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ অর্থাৎ "এটা এ কারণে যে তারা আল্লাহর নাযিল করা ব্যবস্থাকে অপছন্দ করে। সুতরাং তিনি তাদের সকল আমল ধ্বংস করে দিয়েছেন"। (মুহাম্মাদঃ ৯)

৪) যে ব্যক্তি নিজে এ সব অপকর্ম ও চিন্তা থেকে মুক্ত বটে, তবে তার দেশের জনগণ তাওহীদপন্থীদের সাথে শত্রুতা করে, তাদের সাথে লড়াই করে, আর সে ব্যক্তিও তাদের পক্ষে তার জান মাল দিয়ে অংশ গ্রহণ করে। সে ব্যক্তিও কাফির। এখানে বাধ্যবাধকতার অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তার ঐ দেশ থেকে হিজরাত করে অন্য দেশে যাবার সুযোগ আছে।[৪৯]

সাতঃ ইজতিহাদ ও তাকলীদঃ

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম কর্মসূচী ছিল আল্লাহ তায়া'লার কিতাব ও সুন্নাতে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিকে মুসলিমদেরকে আহ্বান করা এবং অন্ধ অনুসরণ ও তাকলীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। তাকলীদ ঐ সময় মুসলিমদের মন মগজকে একদম ভোঁতা করে রেখেছিল। তাই তারা কুরআন কারীম, সুন্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সালফে সালেহীনের আছার সমূহকে পাশ কাটিয়ে পরবর্তী যুগের যার

---

৪৮. হুসাইন ইবনু গান্নাম, তারিখে নাজদ, পৃঃ ৩৬১, ৩৬২।

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭৫, ৪৭৬।

যার ইমামদের অন্ধ অনুকরণে লিপ্ত ছিল। এবং তারা তাদের সামনে এতটাই অসহায় ছিল যেমন লাশ ধৌতকারী ব্যক্তিদের সামনে মৃত ব্যক্তির লাশ নিথর হয়ে পড়ে থাকে।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব মনে করেন যে, মুসলিমগণের বিশুদ্ধ ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার পেছনে বড় কারণ ছিল, কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গাফেল হয়ে পরবর্তী যুগের পণ্ডিতগণের লিখিত কিতাবাদি নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকা। এ কারণেই তাদের মধ্যে এ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, ইজতিহাদের দরোজা পর্যন্ত পৌছা সম্ভব নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, এই অন্ধ তাকলীদের শক্ত দেয়াল ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে, কুরআন কারীম ও সহীহ সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে না পারলে প্রকৃত সংস্কার সম্ভব নয়। মুসলিম সমাজ থেকে ইসলামের নামে প্রচলিত কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতির মূলোৎপাটনও সহজ সাধ্য নয়। তিনি মনে করেন যে, কুরআন কারীম এবং রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহ তো জটিল, কঠিন ও অবোধগম্য শব্দ সম্ভার দিয়ে তৈরি কোন বক্তব্য নয় যে সেগুলো বুঝা অসম্ভব।[৫০] এ কারণে তিনি অন্ধ তাকলীদকে মুশরিকদের ঈমান প্রত্যাখ্যান করার একটি অন্যতম ভিত্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং এটাকে ঐ সব বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত বলে অভিহিত করেছেন যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুশরিকদের বিরোধিতা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ

" دِينُ المشْرِكِينَ مَبْنِيٌّ عَلَى أُصُولٍ أَعْظَمُهَا التَّقْلِيدُ، فَهوَ القَاعِدَةُ الكُبْرَى لِجَمِيعِ الكُفَّارِ أَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ".

"মুশরিকদের ধর্মের অসংখ্য নীতিমালার প্রধান নীতি ছিল 'তাকলীদ'। প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত কাফিরদের প্রধান নিয়ম ও সূত্র ছিল এই তাকলীদ"।[৫১] যার উপর ভিত্তি করে তারা নবী ও রাসূলগণের হকের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করতো।

উল্লেখ্য যে, শায়খ মুহাম্মাদ তাকলীদের বিরোধিতা করলেও তিনি সকল অবস্থায় সকল প্রকার তাকলীদকেই অস্বীকার করেন নি। বরং তাঁর নিকট তাকলীদ কখনো নিষিদ্ধ, আবার কখনো বৈধ। যার পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহর বিস্তারিত দলীলাদি জানা এবং তা থেকে মাসআলা উদ্ভাবন করা সম্ভব তার জন্য তাকলীদ নিষিদ্ধ। অন্যথায় তার জন্য তাকলীদ বৈধ। তবে তা কোন একজনের বেলায় অন্ধ অনুকরণে গোঁড়ামীর পর্যায়ে যেন অবশ্যই না যায়।

শায়খ মুহাম্মাদ এবং তাঁর দাওয়াতের অনুসারীগণ অমৌলিক ও শাখা প্রশাখা মাসলা মাসায়েলের ক্ষেত্রে হাম্বলী মাযহাবের অনুসরণ করতেন। তবে তা গোঁড়ামীর পর্যায়ে

---

৫০. কামাল সাইয়্যেদ দরোবীশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৯।

৫১. মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব, মাজমুআ'তু মুআলাফাতুশ শায়খ, ৬ খন্ড, পৃঃ ২২৮ – ২২৯।

ছিল না যে, দলীল ভিত্তিক না হলেও বা অপেক্ষাকৃত মজবুত দলীল থাকা সত্ত্বেও নিজ মাযহাবের মতামতকে প্রাধান্য দিতে হবে। বরং যে মতের পক্ষেই দলীল বা অপেক্ষাকৃত শক্ত ও সহীহ্ দলীল পাওয়া যেতো সে মতকেই তাঁরা গ্রহণ করতেন। এ কারণে শায়খ মুহাম্মাদ অনেক মাসআলাতে শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ ও ইবনুল কাইয়্যেমের মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং গ্রহণ করেছেন। এটার অর্থ আবার এটাও নয় যে, তিনি এই দুই জন ইমামের তাকলীদ করেছেন। বরং প্রকৃত বিষয় হলো সত্য সত্যের সাথে মিশে যায়। অর্থাৎ দলীল প্রমাণ ভিত্তিক হওয়াতে তাদের মতামত সত্য হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। শায়খ মুহাম্মাদ সত্যপন্থী হিসাবে এ সত্যকেই কোন প্রকার মাযহাবী গোঁড়ামী ছাড়াই গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া তিনি চার মাযহাবের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং এগুলোর কোন একটির অনুসরণকে অস্বীকার করেননি। তিনি কোন মাযহাবের দিকেও কাউকে আহবান করেন নি । তিনি বলেনঃ

"وَلَسْتُ أَدْعُو إِلَى مَذْهَبِ صُوفِيٍّ أو فَقِيهٍ أو مُتَكَلِّمٍ أو إِمَامٍ مِنَ الأَئِمَّةِ الَّذِينَ أَعْظَمُهُمْ مِثْل ابْنُ القَيِّمِ والذَّهَبِيِّ وَابن كَثِير وغيرهِمْ. بَلْ أَدْعُو إِلَى اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَدْعُو إِلَى سُنَّةِ رَسول اللهِ الَّتِي أَوْصَى أَوَّلَ أُمَّتِهِ وَآخِرِهِمْ".

"আমি কোন সূফী মাযহাব বা ফিকহী মাযহাব কিংবা যুক্তিবাদীদের (মুতাকাল্লিমগণ) মাযহাব বা কোন ইমামের মাযহাবের দিকে আহবান করি না...। বরং আমি এক আল্লাহ, যার কোন শরীক নেই তাঁর দিকে ডাকি। আমি আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহর দিকে ডাকি, যার দিকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সকল উম্মাতকে ওসিয়ত করেছেন"।[৫২] বস্তুতঃ শায়খ মুহাম্মাদ নিরঙ্কুশ ইজতিহাদের (ইজতিহাদ মুতলাক) প্রবক্তা নন। এটার দাবীও কেউ করতে পারে না। তবে কোন কোন মাসআলাতে ইজতিহাদ করার সুযোগ আছে বলে তিনি মনে করেন। সংখ্যায় কম হলেও শায়খ মুহাম্মাদ অনেক নতুন নতুন বিষয়ে ইজতিহাদ করেছেন। যেমনঃ মুসলিমের দিয়াত (রক্তপণ) একশত উটের পরিবর্তে আটশত রিয়াল ধার্যকরণ।[৫৩] প্রকৃত অর্থে শায়খের দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়াতের অমৌলিক বিষয়ে ইজতিহাদের বন্ধ দরোজা অথবা প্রায় বন্ধ দুয়ার উন্মুক্ত হয়েছে।[৫৪]

---

৫২. হুসাইন ইবনু গান্নাম, রাওযাতুল আফকার, প্রাগুক্ত, ১ম খঃ, পৃঃ ১৫২ – ১৫৪ ।

৫৩. আব্দুল মুতাআ'ল আল সাঈদী, আল মুজাদদিদুন ফিল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪১।

৫৪. ওয়াহবাহ আল যুহাইলী, আল ইজতিহাদ ফী আল শারীআ'হ আল ইসলামিয়্যাহ, পৃঃ ৯, রিয়াদে অনুষ্ঠিত 'ইসলামী ফিকহ' শীর্ষ সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ, যুল কা'দাহ, ১৩৯৬ হিঃ, আল ইমাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

কোন কোন গবেষক মুজতাহিদ আলিমগণকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা ঃ (১) মুজতাহিদ মুতলাক বা নিরঙ্কুশ মুজতাহিদ, (২) কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের সাথে সম্পর্কিত মুজতাহিদ, (৩) কোন একটি মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত মুজতাহিদ, (৪) অগ্রাধিকার প্রদানকারী মুজতাহিদ, এবং (৫) কোন মাযহাবের নীতিমালা সম্পর্কে অভিজ্ঞ মুজতাহিদ, যিনি নীতিমালা ও বর্ণনাগুলোকে যাচাই বাছাই করে অধিক সঠিক ও শক্তিশালী বর্ণনাটিকে গ্রহণ করেন।[৫৫] শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব এগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ 'একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের সাথে সম্পর্কিত মুজতাহিদ' হিসাবে পরিগণিত। কারণ তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন সময় ইজতিহাদ করে এই মাযহাবের মতামত ও উক্তি থেকে বের হয়ে অধিক প্রমাণ ভিত্তিক মতামত দিয়েছেন। আবার তৃতীয় প্রকারের মধ্যে তাঁকে শামিল করা যায়। কেননা হাম্বলী মাযহাবের অভ্যন্তরে তাঁর কিছু কিছু নিজস্ব ইজতিহাদ ভিত্তিক মতামত রয়েছে।[৫৬]

দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তুঃ

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব উপরে বর্ণিত মৌলিক নীতিমালার আলোকে তাঁর দাওয়াত ও সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তাঁর এ আন্দোলনকে ব্যাপক গণভিত্তি প্রদানের লক্ষ্যে প্রচারের যাবতীয় উপায় অবলম্বন করেন। ওয়াজ নসীহত বক্তৃতা, চিঠি পত্র, বাহাস মুনাযারা, বই পুস্তক ও ইসলামী সাহিত্য রচনা ইত্যাদি। তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম ও সংস্কার কর্ম পর্যালোচনা করলে এটা পরিস্কার হয় যে তিনি কুরআন কারীম, রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহ এবং সালফে সালিহীনের অনুসরণে খাঁটি ইসলামের দিকে দাওয়াত দান করেছেন। তাঁর দাওয়াতের সার কথা ছিল নিরূপ ঃ

১) খাঁটি তাওহীদ, বিশুদ্ধ আকীদাহ বিশ্বাস এবং এর পরিপন্থী শিরক, বিদ'আত ও এর উপকরণাদি থেকে ইসলামী রসম রেওয়াজকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করা।

২) ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবেশকৃত ও নবপ্রবর্তিত বিষয়াদি ও ধর্মীয় অপসংস্কৃতি দূরীভূত করা।

৩) সালফে সালিহীনের অনুসৃত পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করা।

৪) আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'য়াতের পরিপন্থী সকল দল, উপদল ও ফিরক্বার বিরোধিতা করা।

৫) ইসলামী শরীয়াহ মুতাবিক সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা।

---

৫৫. যাকারিয়া আল বাররি, উসূল আল ফিকহ আল ইসলামী, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭ইং, পৃঃ ৩২৩, ৩২৫।

৫৬. মুহাম্মাদ ইবনু সোলায়মান আল সালমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭।

৬) পীর, ওলী ও সৎ ব্যক্তিদের উসীলাহ করে প্রার্থনা করাকে অস্বীকার করা।

৭) ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়গুলোকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা।

উল্লেখ্য যে, শায়খ মুহাম্মাদ ইসলাম বিনষ্টকারী হিসাবে দশটি বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন। সেগুলো হলো ঃ[৫৭]

(১) ইবাদাত বন্দেগীতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা।

(২) ব্যক্তি ও আল্লাহর মাঝে কাউকে মাধ্যম বানানো, তার নিকট দু'আ করা এবং তার সুপারিশের প্রত্যাশী হওয়া।

(৩) মুশরিকদেরকে কাফির মনে না করা। কিংবা তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে মনে কোন সংশয় থাকা এবং কুফরী মতবাদকে বিশুদ্ধ মনে করা।

(৪) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক উপস্থাপিত ইসলামী জীবন বিধানের চেয়ে অন্য কোন বিধানকে পরিপূর্ণ মনে করা এবং ইসলামী শাসন ব্যবস্থার চেয়ে অন্য কোন শাসন ব্যবস্থাকে উত্তম মনে করা।

(৫) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে যে বিধান এসেছে তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য এবং অপছন্দ করা। কেননা মহান আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

অর্থাৎ " এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে অপছন্দ করেছে। তাই আল্লাহ তাদের সকল ভাল কাজকে বরবাদ করে দিয়েছেন"।

(মুহাম্মাদঃ ৯)

(৬) আল্লাহর দীনের কোন বিষয় নিয়ে বা ছাওয়াব কিংবা শাস্তির বিষয় নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

قُلْ أَبِاللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ . لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ

অর্থাৎ " আপনি বলুনঃ আল্লাহ, তাঁর আয়াত সমূহ এবং তাঁর রাসূলকে নিয়ে তোমরা ঠাট্টা মশকারা করছো? তোমরা ওযর পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান পোষণ করার পর কুফরী করে বসেছো"। (আত্ তাওবাহঃ ৬৫, ৬৬)

(৭) যাদু কর্ম করা কিংবা যাদুর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী হলোঃ

---

৫৭. মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব, মাজমুআ'তু মুআলাফাতুশ শায়খঃ (আল রিসালাহ আল তাসিআ'হ), ৬ খন্ড, পৃঃ ২৫৮, ২৫৯। এবং বুহুসু নাদাওয়াতি দাওয়াত আল শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ২য় খন্ড, পৃঃ ৩০৪ - ৩০৫ ।

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ

অর্থাৎ " তারা দুজন যাদু শিক্ষার্থীকে এ কথা বলেই শিক্ষা দিত যে, নিশ্চয় আমরা নিজেরাই একটি মস্তবড় পরীক্ষা। সুতরাং তুমি কুফরী করো না"। (আল বাকারাহঃ ১০২)

(৮) মুসলিমদের বিরুদ্ধে অমুসলিম ও মুশরিকদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর বাণী হলোঃ

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ

অর্থাৎ "আর যে তাদেরকে বন্ধু বানিয়ে নেবে সে তাদের দলের অন্তর্ভুক্ত হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না"। (আল মায়েদাহঃ ৫১)

(৯) এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসরণ করা আমার জন্যে অপরিহার্য নয়। কিংবা তাঁর উপস্থাপিত শরীয়া'তের উর্দ্ধে নিজেকে দাবী করা এই যুক্তি দেখিয়ে, যেমন খিযির (আ) এর জন্যে মূসা (আ) এর শরীয়া'তের সীমানা থেকে বাইরে থাকার সুযোগ ছিল।

(১০) আল্লাহর দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া যে, দীন শেখেও না এবং দীন অনুযায়ী আমলও করে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করেনঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ

অর্থাৎ " তার চেয়ে যালিম আর কে আছে যার নিকটে তার রবের আয়াতগুলোর উল্লেখ করা হয়, অতঃপর সে সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। নিশ্চয় আমরা অপরাধীদের বদলা নেব" । (আস্ সাজদাহঃ ২২)

দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের বৈশিষ্টঃ

শায়খ মুহাম্মাদ কর্তৃক পরিচালিত দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনকে নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে গভীর ভাবে নিরীক্ষণ করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্টগুলো স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ঃ

(১) এই আন্দোলন হলো আল্লাহর দীনকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), সাহাবায়ে কিরাম এবং উম্মাতের পূর্ববর্তী নেক লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণে নবায়ন করার আন্দোলন।

(২) এই আন্দোলন নতুন কোন মাযহাব নয়, যা সুপরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত চার ফিক্বহী মাযহাব ও এগুলোর অনুসারীদের বিরোধিতা করে।

(৩) শায়খ মুহাম্মাদ ইবনুল আবদিল ওয়াহহাব সালফে সালিহীনের আকীদাহর সঠিক ধারক বাহক লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যারা যুগে যুগে, দেশে দেশে

মানুষদেরকে আল্লাহর পথে ডেকেছেন, তাওহীদ ও আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং নিষ্ঠার সাথে একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করার লক্ষ্যে আহ্বান জানিয়েছেন।

(৪) ফিক্বহী মাসআলাহ ও মাসায়েলের ক্ষেত্রে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের অনুসারী ছিলেন। তাই তিনি নিশ্চিত সালাফী আক্বীদায় বিশ্বাসী ছিলেন। হানাফী, মালেকী ও শাফিয়ী' মাযহাবের অনুসারীগণও যেমন সালাফী আকীদায় বিশ্বাসী ।

শায়খ মুহাম্মাদের লিখিত পুস্তকাদিঃ

আরব দেশের প্রসিদ্ধ লেখক প্রিন্স শাকিব আরসালান আধুনিক ইসলামী বিশ্বের ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়্যেদ জামাল উদ্দীন আফগানী সম্পর্কে একটি মূল্যবান উক্তি করে ছিলেন। তা হলো ঃ

" وبالجملة فإنّه لم يكن يَحفِلُ بِوَفْرَةِ التصانيفِ وإنما كَانَ يُؤَلِّفُ أُمَماً ويُصَنِّفُ مَمَالِكَ "

“সাইয়্যেদ জামাল উদ্দীন আফগানী প্রচুর সংখ্যক গ্রন্থাদি রচনা করেননি সত্য, তবে তিনি একটি জাতি ও একটি দেশ রচনা করে গিয়েছিলেন”।[৫৮] এই প্রসিদ্ধ উক্তিটি শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের ক্ষেত্রেও কিছুটা তারতম্য সহ প্রযোজ্য হতে পারে। বস্তুতঃ তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের উপর যেসব গ্রন্থাদি ও চিঠি পত্র লিখেছেন তার সংখ্যা মোটেও কম নয়। উপরন্তু ইলম, তত্ত্ব, তথ্যাদি, দলীল প্রমাণ ও যৌক্তিকতার দিক থেকে লেখাগুলোর মান খুবই উন্নত। তিনি পূর্ববর্তী হাদীছবিশারদগণের তরীকা অনুযায়ী কুরআন কারীম ও সুন্নাহ ভিত্তিক সুস্পষ্ট বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তাই তাঁর লেখনীতে যুক্তিতর্কবিদ এবং পরবর্তী ফিক্বাহবিদগণের মতো গ্রীক ও অন্যান্য দর্শনের কোন ছোঁয়া নেই। কেননা সত্য চির ভাস্বর, তা মেকআপ দিয়ে তুলে ধরার প্রয়োজন নেই। 'সত্যের' নিজ সত্তার মধ্যেই এক সম্মোহনী আকর্ষণ শক্তি বিদ্যমান যা সর্বদাই 'সত্য' সন্ধানীদেরকে আকর্ষণ করে থাকে। তাঁর লেখাগুলোর বিশেষত্ব হলোঃ

(১) লেখাগুলো কুরআনী উদ্ধৃতিতে সমৃদ্ধ। দলীল-প্রমাণ ও যুক্তিগুলো মূলতঃ কুরআন মাজীদ ও সুন্নাহ থেকে গৃহীত।

(২) সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। উচ্চাঙ্গ ভাষার জটিলতায় তা বোধগম্যহীন নয়।

---

৫৮. স্টুডার্ড, সাকিব আরসালান, হাযিরুল আ'লাম আল ইসলামী, কায়রো, ২য় সংস্করণ, ১৯৩২ইং, ১ম খন্ড, পৃঃ৩০১।

(৩) লেখার ছত্রে ছত্রে নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা ও ইখলাসের ছাপ স্পষ্ট। তাই তা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী।

(৪) গ্রীক ও অন্যান্য দর্শনের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ।

(৫) ঐ সব সূফী পরিভাষা থেকে মুক্ত যে পরিভাষাগুলো গ্রীক দর্শন ও হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থ "বেদ" থেকে গৃহীত।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদির তালিকা ঃ

(১) **কিতাবুত তাওহীদ** (كتاب التوحيد) ঃ এ বইটি সর্বজন বিদিত একটি প্রসিদ্ধ পুস্তক। যা মূলত আকীদাহ ও এতদ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে লিখিত। যেমনঃ তাওহীদ, শিরকের অনিষ্টতা এবং শিরকের উছীলা। বিভিন্ন ভাষায় বইটি অনূদিত হয়েছে। এ বইটির দুটি বিখ্যাত শারহ (ব্যাখ্যা) আছেঃ (১) আল দুররুন নাদীদ, লেখক আহমাদ ইবনু হুসাইন (২) ফাতহুল মাজীদ ফী শারহে কিতাবুত তাওহীদ, লেখক শায়খ সুলাইমান ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ। তবে তিনি বইটি সম্পন্ন করতে পারেননি। পরবর্তীতে শায়খ আব্দুর রহমান ইবনু হাসান ইবনু মুহাম্মাদ এটি সম্পন্ন করেন।

(২) **কাশফুশ শুবুহাত** (كشف الشبهات) (সংশয় নিরসন)ঃ এ পুস্তকটিকে "কিতাবুত তাওহীদের" সম্পূরক বলা যায়। এ কিতাবটিতে তাওহীদ সম্পর্কে উত্থাপিত নানা সংশয় ও বিভ্রান্তির নিরসন করা হয়েছে। যেমনঃ পীর, ওলী ও গাওছদেরকে ডাকা, উসীলা ও সাহায্য প্রার্থনা এবং শাফা'য়াত ইত্যাদি বিষয় কুরআন কারীম ও সুন্নাহ ভিত্তিক দলীল প্রমাণের মাধ্যমে পরিষ্কার করা হয়েছে।

(৩) **আল উসুলুছ ছালাছাহ ওয়া আদিল্লাতুহা** (الأصول الثلاثة وأدلتها) (তিনটি মৌলনীতি ও এর প্রমাণাদি) ঃ বইটিতে তিনটি মৌলিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলো জানা সকল মানুষের অপরিহার্য। যেমনঃ (১) মহান প্রতিপালককে জানা (২) দীন ইসলামকে জানা (৩) রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানা।

(৪) **শুরুতুস সালাহ ওয়া আরকানুহা** (شروط الصلاة وأركانها) (নামাজের শর্ত ও রোকন সমূহ)ঃ এ বইতে তিনি সালাতের শর্তাদির উল্লেখ করেছেন। যেমনঃ মুসলিম হওয়া, জ্ঞানবান হওয়া, সুস্থ বিবেক সম্পন্ন হওয়া, পবিত্র হওয়া, অপবিত্রতা দূর করা, ওয়াক্ত হওয়া, কিবলামুখী হওয়া, নিয়াত করা। তাছাড়া নামাযের আরকান ও ওয়াজিবগুলোর বর্ণনাও এ বইটিতে রয়েছে।

(৫) **আল কাওয়ায়িদ আল আরবায়া'হ** (القواعد الأربعة) (চারটি মূলনীতি)ঃ এ পুস্তকে তাওহীদের কিছু দিক নিয়ে ৪টি সূত্রের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে। যেমনঃ (১) আরবের কাফিরগণ আল্লাহর প্রতি এ বিশ্বাস পোষণ

করতো যে, তিনি স্রষ্টা, রিযকদাতা, মহাব্যবস্থাপক। এতদসত্তেও তারা মুসলিম হিসাবে অভিহিত ছিলনা। (২) আরবের কাফিরগণ তাদের ওলীদেরকে (দেব দেবী) আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং সুপারিশের আশা করেই ডাকতো। (৩) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফেরেস্তা, নবী, নেক বান্দা, গাছ বৃক্ষ, পাথর, সূর্য এবং চন্দ্রের ইবাদাতকারী সকলের বিরুদ্ধে সমানভাবেই যুদ্ধ করেছেন। মুশরিকদের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। (৪) বর্তমান যুগের মুশরিকগণ জাহিলী যুগের মুশরিকগণের চেয়েও অধিক অধপতনে নিমজ্জিত। এ বিষয়গুলোকে কুরআন দ্বারা পরিষ্কার করেছেন।

(৬) **উসূলুল ঈমান** (أصول الإيمان) (ঈমানের মূলনীতি সমূহ)ঃ এখানে ঈমানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(৭) **কিতাব ফযলিল ইসলাম** (كتاب فضل الإسلام) (ইসলামের ফযীলত)ঃ এ বইটির মাধ্যমে শিরক ও বিদ'আতকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া ইসলামের শর্তগুলো নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

(৮) **কিতাবুল কাবায়ির** (كتاب الكبائر) (কবীরা গুনাহ সমূহ)ঃ কুর্আন ও সুন্নাহর আলোকে সকল প্রকার কবীরা গুনাহ– এক এক করে বর্ণনা করা হয়েছে।

(৯) **নসীহাতুল মুসলিমীন** (نصيحة المسلمين) (মুসলিমদের প্রতি উপদেশ)ঃ বইটিতে সকল প্রকার ইসলামী শিক্ষা ও এতদসংশ্লিষ্ট হাদীছগুলোকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

(১০) **ছিত্তাতু মাওয়াযি' মিনাস্ সীরাহ** (ستة مواضع من السيرة) (সীরাতের ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়) ঃ এ বইতে নবী চরিত ও তাঁর জীবন ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ছয়টি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ঃ ওহী নাযিলের সূচনা, তাওহীদের শিক্ষা এবং কাফিদেরকে জবাব দান, আবু তালিবের মৃত্যু, হিজরাতের উপকারিতা ও শিক্ষা, রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুর পর মুরতাদদের ঘটনা ইত্যাদি।

(১১) **তাফসীরুল ফাতিহা** (تفسير الفاتحة) ঃ সূরা আল ফাতিহার তাফসীর ।

(১২) **মাসায়েলুল জাহিলিয়্যাহ** (مسائل الجاهلية) (জাহিলী যুগের মাসায়েল)ঃ এ বইটিতে শায়খ মুহাম্মাদ ১৩১টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, যেগুলো জাহিলী যুগের লোকদের আকীদাহ বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেগুলোর বিরোধিতা করেছেন।

(১৩) তাফসীরুশ শাহাদাহ (تفسير الشهادة) (কালেমায়ে শাহাদাতের ব্যাখ্যা) ঃ বইটিতে মূলতঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর ব্যাখ্যা ও তাওহীদের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(১৪) কতিপয় সূরার তাফসীর (تفسير لبعض سور القرآن) ঃ এখানে শায়খ কুরআন মাজীদের কতিপয় সূরার তাফসীর করেছেন এবং একটি আয়াত থেকেই তিনি ১০টি মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন।

(১৫) কিতাবুস্ সিরাহ (كتاب السيرة) (সীরাত গ্রন্থ) ঃ এটি মূলতঃ 'সীরাতে ইবনে হিশামের' সার সংক্ষেপ।

(১৬) আল হাদয়ুন নববী (الهدي النبوي) (নবীর শিক্ষা) ঃ এ বইটিও মূলতঃ শায়খ ইবনুল কাইয়্যেম রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'যাদ আল্ মা'আদ' এর সার সংক্ষেপ।

(১৭) মুফীদুল মুসতাফীদ (مفيد المستفيد) ঃ এখানে সময়ের পরিবর্তনে মূর্তি পূজা এবং আল্লাহর দুশমনদের সাথে দুশমনী করা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

(১৮) আদাবুল মাশই ইলাস সালাত (آداب المشي إلى الصلاة) ঃ সালাত ও জামায়াতের সাথে সালাত আদায় বিষয়ের উপর রচিত বই।

(১৯) মুখতাসারু ফাতহিল বারী (مختصر فتح الباري) ঃ এটি মূলতঃ ইবনু হাজর আল আসকালানী লিখিত সহীহ আল বুখারীর প্রসিদ্ধ শারহ 'ফাতহুল বারীর' সার সংক্ষেপ।

(২০) মুখতাসারুল শারহুল কাবীর (مختصر الشرح الكبير)।

(২১) মুখতারুস সাওয়ায়ি'ক্ব (مختصر الصواعق) ।

(২২) মুখতাসারুল ঈমান (مختصر الإيمان) ।

(২৩) আহাদীছুল ফিতান (أحاديث الفتن) ।

(২৪) ফাযায়েলুল কুরআন (فضائل القرآن) ।

(২৫) মুখতাসারু সহীহিল বুখারী (مختصر صحيح البخاري) ।

(২৬) মুখতাসারুল ইনসাফ (مختصر الإنصاف)।

(২৭) মুখতাসারুল আক্বল ওয়ান নাক্বল (مختصر العقل والنقل) ।

(২৮) মুখতাসারুল মিনহাজ (مختصر المنهاج) ।

(২৯) মাজমুউল হাদীছ আলা আবওয়াবিল ফিক্বহ (مجموع الحديث على أبواب الفقه)।

এ ছাড়া শায়খ মুহাম্মাদ সমাজের বিভিন্ন দায়িত্বশীল ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর দাওয়াত, তাঁর প্রতি আরোপিত অপবাদের জওয়াব দিতে গিয়ে বহুসংখ্যক চিঠি পত্র লিখেছেন যা শায়খের পত্রাবলী হিসাবে মুদ্রিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, শায়খের এ সব পুস্তক প্রায় মুদ্রিত। বিশেষ করে তাঁর দাওয়াত সম্পর্কিত পরবর্তিতে লিখিত অনেকগুলো বড় বড় ভলিউমের মধ্যে লেখাগুলো সংরক্ষিত রয়েছে। ১৪০০ হিঃ সনে আল ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাদশাহ ফায়সাল অডিটোরিয়ামে শায়খের দাওয়াত ও কর্মের উপর আয়োজিত এক সেমিনারকে কেন্দ্র করে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের লিখিত বইগুলোকে ১৫ খণ্ডে মুদ্রণ করা হয়। শায়খের লিখিত মূল্যবান রচনা থেকে তাঁর দাওয়াত, এর প্রকৃতি সম্পর্কে যেমন শক্তিশালী প্রমাণাদি পাওয়া যায়, অনুরূপভাবে তাঁর উপর আরোপিত অপবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাবও সেখানে রয়েছে। যা প্রতিনিয়তই তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধবাদিদেরকে উপহাস করছে।

দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারঃ

শায়খ (রহঃ) দারঈয়া'হ শহরে আগমনের পর থেকেই সেখানকার সরকার ও অধিবাসীগণ দাওয়াতী কাজের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হয়ে যান। ফলে তাঁরা নজদ ও এর আশ পাশের শাসকগণকে শায়খের দাওয়াত সম্পর্কে অবহিত করেন এবং এর দিকে আহবান করেন। এ কারণে তাঁরা বিভিন্ন রকমের বিরোধিতা, কুৎসা রটনা এবং মিথ্যা অপবাদের নির্মম শিকারে পরিণত হন। কিন্তু সত্যের আওয়াজ বৃদ্ধি পেতেই থাকে। এর ফল স্বরূপ উয়াইনার শাসক ১১৫৮/১১৫৯ হিজরীতে শায়খের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং শরীয়াতের ফৌজদারী দন্ডবিধি জারী করার অঙ্গীকার করেন। এর অল্প কিছুদিন পরেই হুরাইমালার অধিবাসীগণ এসে তাঁর হাতে বাইয়াত নেন।

অন্য দিকে আমীর মুহাম্মাদ ইবনু সউদের সহযোগিতার ফসল হিসাবে যাকাত ও খুমুসের (গনীমতের সরকারী প্রাপ্যাংশ) সমস্ত সম্পদই শায়খের নিকট পেশ করা হতো। তিনি সে সম্পদ শরীয়া'হ মুতাবিক আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন। একটি কানা কড়িও সঞ্চয় করতেন না। একইভাবে মুহাম্মাদ ইবনু সউদের পুত্র আব্দুল আযীয (মৃঃ ১২১৮ হিঃ/ ১৮০৩ ঈ) ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সউদও শায়খের অনুমতি ও অনুমোদন ব্যতিরেকে কিছুই করতেন না।

শায়খ মুহাম্মাদ রিয়াদ বিজয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অভাব অনটন ও ঋণগ্রস্ত জীবন যাপন করতেন। এতদসত্বেও তিনি আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করতেন । ১১৮৭ হিঃ/১৭৭৩ ঈ. সনে রিয়াদ জয় করার মধ্য দিয়ে শায়খের দাওয়াতী মিশন সফলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে এবং এ ভূখন্ডটি আল্লাহর মেহেরবানীতে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তখন শায়খ মুহাম্মাদ যাকাত ও গনীমতের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে শাসক আব্দুল আযীযের

হাওয়ালায় দিয়ে দেন। তিনি বাইতুল মালের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। এবং শুধুমাত্র শিক্ষা দানের কাজে সমস্ত সময় ও শক্তি নিয়োগ করেন। তবে আব্দুল আযীয শায়খের পরামর্শ ছাড়া কোন কাজই করতেন না।

নজদ অঞ্চলের বাইরে দাওয়াতী কাজঃ

শায়খ মুহাম্মাদের দাওয়াতী কার্যক্রম প্রথমে নজদ ও এর আশপাশের এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বাস্তবে নজদ এলাকাতেই যে শুধু দাওয়াত ও সংস্কার কর্মের প্রয়োজন ছিল তা নয় বরং এ দাওয়াতের প্রয়োজন ছিল সর্বত্র। ইসলামী বিশ্বের সব স্থানেই ঈমান আকীদাহ পরিপন্থী কার্যক্রম ও অপসংস্কৃতির সয়লাব চলছিল। তাই গোটা মুসলিম বিশ্বেই তাওহীদের সঠিক দাওয়াত এবং প্রকৃত সংস্কারের খুবই প্রয়োজন ছিল। তবে নিজ ঘর, আত্মীয় স্বজন এবং জন্মভূমি থেকে কাজ শুরু করা অপরিহার্য। এ জন্যেই প্রথমে নজদের উয়াইনাহ, হুরাইমালা, দারঈয়া'হ এবং আরিদ এলাকায় শায়খের দাওয়াতের প্রাণ কেন্দ্র হিসাবে ব্যাপক দাওয়াতী ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম শুরু হয়। অল্প দিনের মধ্যেই সউদ পরিবারের সহযোগিতায় শায়খের দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে এ দাওয়াত সরাসরি কিংবা এই দাওয়াতের অনুসারীদের মাধ্যমে পূর্বে জাকার্তা থেকে পশ্চিমে নাইজিরিয়া পর্যন্ত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এবং মুসলিম উম্মাহর বিবেককে ব্যাপকভাবে নাড়া দেয়। সত্যের পথ তাদের জন্য আলোকিত হয়ে উঠে। এই আন্দোলনের প্রভাবে প্রায় প্রত্যেকটি মুসলিম দেশেই শিরক মিশ্রিত আকীদাহ বিশ্বাস, বিদ'আতে পরিপূর্ণ মুসলিম সমাজের রসম রেওয়াজ, ইসলাম পরিপন্থী অপসংস্কৃতি ও যাবতীয় কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে সত্য, খাঁটি ও নির্ভেজাল তাওহীদ ও তাওহীদ ভিত্তিক মুসলিম সমাজ গড়ে তোলার আন্দোলন শুরু হয়। এ পর্যায়ে আমরা এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের কতিপয় দেশের কথা উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরার প্রয়াস পাব, যে দেশগুলোতে শায়খ মুহাম্মাদের দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের বিরাট প্রভাব পড়েছিল। আমাদের এ কথার অর্থ এটা নয় যে, শায়খের দাওয়াতের প্রভাব মুসলিম বিশ্বের বাইরের কোন দেশ বা মহাদেশে পড়েনি। বরং শায়খের দাওয়াতের প্রভাব বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার মাধ্যমে ইউরোপ মহাদেশেও পৌছে যায়।[৫৯]

এশিয়া মহাদেশে দাওয়াতের প্রভাবঃ

এশিয়া মাহাদেশের সকল দেশ নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি দেশের উল্লেখ করাকে যথেষ্ট মনে করছি। অপরদিকে সংশ্লিষ্ট দেশের ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের উপর শায়খের দাওয়াতের কী প্রভাব পড়েছে তা বলার ও লেখারও সুযোগ নেই। এখানে শুধুমাত্র শায়খের দাওয়াতের সাথে ঐ সংস্কার আন্দোলনের

---

৫৯. আহমাদ আব্দুল গাফুর, মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব, বৈরুত, ২য় সংস্করণ, ১৯৭২ইং, পৃঃ ২০৮।

সম্পর্কের কথা তুলে ধরাই প্রাসঙ্গিক। এশিয়া মহাদেশের উল্লেখযোগ্য দেশগুলো হলোঃ

একঃ ইয়ামান ও উপসাগরীয় দেশ সমূহঃ

শায়খের দাওয়াত ও সংস্কারের প্রাণকেন্দ্র বর্তমান সউদী আরবের[৬০] সীমানা পেরিয়ে অন্যান্য এলাকাগুলোতেও এই দাওয়াত ব্যাপক ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তন্মধ্যে ইয়ামান অন্যতম। ইয়ামানের অনেক আলিম শায়খের দাওয়াত ও সংস্কারকর্ম দ্বারা প্রভাবান্বিত হন এবং গণ-মানুষের নিকট এই দাওয়াতের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী তুলে ধরেন। এ সকল প্রসিদ্ধ আলিমগণের অন্যতম হলেন শায়খ প্রিন্স মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল সানআ'নী (মৃঃ ১১৮২ হিঃ) । তিনি একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তাঁর কবিতার সংকলন রয়েছে। তিনি ইয়ামানবাসীদেরকে তাওহীদ, একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা, নেক লোকদের কবরের উসীলা করা থেকে দূরে থাকার প্রতি আহবান জানিয়েছেন। দারঈয়্যাতে শায়খ মুহাম্মাদের কাছে প্রেরিত এক কবিতায় তিনি শায়খের দাওয়াতের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এ ধরণের দাওয়াতের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

ইয়ামানের আরেকজন প্রসিদ্ধ আলিম হলেন শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আলী আশ্ শাওকানী (মৃঃ ১২৫০ হিঃ)। তিনিও শায়খ মুহাম্মাদের মতো মুসলিমদেরকে তাওহীদ ও ইজতিহাদের দিকে আহবান করেছেন এবং অন্ধ তাকলীদ ও বিদ'আতের কঠোর বিরোধিতা করেছেন। শায়খ মুহাম্মাদের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি এক মর্মস্পর্শী শোকগাথা লেখেন। বস্তুতঃ এ দুজন প্রসিদ্ধ আলিমের ইয়ামানবাসীদের নিকট অনেক বড় মর্যাদা ছিল। ফলে তাঁদের দাওয়াতের এবং সউদী রাষ্ট্রের তৎকালীন রাজধানী দারঈয়্যাহ থেকে প্রেরিত মুবাল্লিগদের দাওয়াতের মাধ্যমে শায়খের দাওয়াত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

একইভাবে তৎকালীন সউদী সরকারের রাজনৈতিক প্রভাব এবং মুবাল্লিগদেরকে আশ পাশের এলাকাগুলোতে প্রেরণের মাধ্যমেও শায়খের দাওয়াত সে অঞ্চলগুলোতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। যেমনঃ কাতার, বাহরাইন, ওমান উপকূলে অবস্থিত কাওয়াসিম, সিরিয়ার সীমান্তবর্তী বেদুঈন এলাকা বিশেষ করে 'হাওরান এবং কুরক। তাছাড়া ইরাকেও এ দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে। তবে শিয়াদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে ইরাকে এ দাওয়াত খুব বেশি সম্প্রসারিত হতে পারেনি। কোন কোন গবেষকের মতে শায়খ মুহাম্মাদের ৯২ বছর বয়সে মৃত্যুর সময় উপসাগরীয় এলাকায় প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ এই দাওয়াতের অনুসারী হয়।[৬১]

দুইঃ ভারতঃ

---

৬০. সউদী আরবের সীমানা হলোঃ উত্তরে সিরিয়া, দক্ষিণে ইয়ামান, পূর্বে আরব উপসাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর।

৬১. বুহুসু নাদাওয়াতি দাওয়াত আল শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃঃ ২১৯।

শায়খ মুহাম্মাদের দাওয়াতী কার্যক্রমের মত দাওয়াত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতীয় আলিমদের দ্বারা শুরু হয়। এ ক্ষেত্রে সর্বজনগ্রাহ্য আলিমে দীন, মুজাদ্দিদ শায়খ শাহ ওয়ালীউলাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪ – ১১৭৬ হিঃ/ ১৭০৩ – ১৭৬২ঈ.) অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মূলতঃ ইসলামের সঠিক দাওয়াত, বিশুদ্ধ আকীদাহ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা, অন্ধ তাকলীদের বিরোধিতা, কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমলের আন্দোলনের বীজ তিনি রোপণ করেন।[৬২] শাহ ওয়ালীউল্লাহ ও শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব জ্ঞানার্জনের একই ভান্ডার, মসজিদে নববী থেকে শিক্ষা অর্জন করেছেন।

তবে শায়খ মুহাম্মাদের দাওয়াতের হুবহু অনুরূপ দাওয়াত পরবর্তিতে ভারতের আরো অন্যান্য আলিম ও মুসলিম নেতাদের দ্বারাও শুরু হয়। এই দাওয়াত একাধারে ইসলামী সংস্কার ও বৃটিশ খেদাও আন্দোলনে রূপ নেয়।

১৮২১ ঈ. সনে সাইয়্যেদ আহমাদ বেরেলভী (১২০১ – ১২৪৬হিঃ/ ১৭৮৬ – ১৮৩১ ঈ.) হাজ্জব্রত পালন করার জন্য মক্কায় গমন করেন এবং শায়খ মুহাম্মাদের দাওয়াতের অনুসারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা তাঁকে দাওয়াতের কর্মসূচী ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন। মক্কা থেকে ফিরে এসে দাওয়াতী কাজ শুরু করেন। শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কার নিরসনে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তাছাড়া এই দাওয়াতের মাধ্যমে মুসলিম জাতীয় চেতনা সৃষ্টি করে বৃটিশ বেনিয়ার শাসনের অবসান করা, শিখদের প্রভাব খর্ব করা এবং ভারত বর্ষে ইসলামী রাষ্ট্র পুনঃপ্রবর্তন করার লক্ষ্যে মুসলিমদেরকে সংগঠিত করেন। অল্প দিনেই তাঁর দলে হাজার হাজার মুসলিম যোগ দেন। তিনি সীমান্ত প্রদেশকে কেন্দ্র করে পৃথক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। অল্প দিনের ব্যবধানে সিন্দ বেলুচিস্তান সহ আফগানিস্তানের কিছু অংশও তাঁর রাষ্ট্রের আওতায় আসে। তারপর কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। শিখদের সঙ্গে একাধিক যুদ্ধে তাদেরকে পরাস্ত করতে পারলেও ইংরেজদের সহযোগিতায় শিখদের সাথে সংঘটিত ১৮৩১ ঈ. সনে বালাকোটের যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। এর মাধ্যমে তাঁর ইসলামী রাষ্ট্রের পতন হয়। তবে তিনি ভারত বর্ষে সংস্কার আন্দোলনের যে বীজ বপন করে যান পরবর্তী সকল দীনী আন্দোলনই তার স্বাক্ষর বহন করে। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, তাঁর এবং তাঁর অনুসারীদের আন্দোলনের কারণেই পরবর্তীতে 'ভারত স্বাধীনতা আন্দোলন' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যার ফলশ্রুতিতেই ১৯৪৭ ঈ. সালে ভারত ও পাকিস্তান ইংরেজদের দুঃশাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।[৬৩]

সাইয়্যেদ আহমাদ বেরেলভীর দাওয়াত ও জিহাদী কাজের একান্ত সহযোগী ও দক্ষিণ হস্ত হিসাবে যিনি পরিচিত ছিলেন তিনি হলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহর পৌত্র স্বনামধন্য আলিম, শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী উমর ফারুক

৬২. ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ গালিব, আহলে হাদীছ আন্দোলন, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, রাজশাহী, ১ম, সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃঃ ২৫৫, ২৫৬।

৬৩. স্টুডার্ড, সাকিব আরসালান, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৬৩।

(রা) এর ৩৩তম অধঃস্তন পুরুষ আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈল ইবনু শাহ আব্দুল গনী (১১৯৩ - ১২৪৬হিঃ/ ১৭৭৯ - ১৮৩১ ঈ.)। তিনিও ১৮২১ঈ. হাজ্জ আদায় করেন এবং হারামাইন শরীফাইন থেকে ফিরে এসে সাইয়্যেদ আহমাদের নেতৃত্বে গোটা ভারতবর্ষে ব্যাপক দাওয়াতী কাজ শুরু করেন। বৃটিশ গভর্ণমেন্ট এই আন্দোলনের কর্মীদেরকে একটি ভয়ংকর রাজনৈতিক দল ও 'বিদ্রোহী' হিসাবে আখ্যায়িত করে তাঁদের উপর নানা রকমের নির্যাতন চালাতো। মাওলানা আবুল কালাম আযাদের (মৃঃ ১৮৮৮ - ১৯৫৮ ঈ.) একটি মন্তব্যে এ কথার প্রমাণ মেলে। তিনি বলেনঃ "হিন্দুস্থানে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের পক্ষ হতে ওয়াহহাবীদেরকে একটি ভয়ংকর রাজনৈতিক দল হিসাবে গণ্য করা হ'ত। তার অন্যতম কারণ ছিল এই যে, এই জামা'আতটিকে মাওলানা ইসমাঈল শহীদ প্রতিষ্ঠিত জামা'আত মনে করা হত, যিনি জিহাদের উপরে এই আন্দোলনের বুনিয়াদ রচনা করেছিলেন এবং শিখদের বিরুদ্ধে বাস্তবে জিহাদ করেছিলেন। মাওলানা শহীদের পরে মাওলানা ছাদেকপুরীর নেতৃত্বে এই আন্দোলন নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হয় এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ... এই সব কারণে কাউকে 'ওয়াহহাবী' সন্দেহ করলেই বৃটিশ সরকার তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রেফতার করত এবং মিথ্যা মামলা, ফাঁসি, দ্বীপান্তর, যাবজ্জীবন কারাদন্ড, সম্পত্তি বাযেয়াফত প্রভৃতি শাস্তি তাদের ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ছিল"।[৬৪] তিনিও সাইয়্যেদ আহমাদের সাথেই 'বালাকোটের' যুদ্ধে ১৮৩১ ঈ. সালে শাহাদাত বরণ করেন।

শায়খের দাওয়াতের অনুরূপ দাওয়াতে যাঁরা ব্যাপক ভূমিকা রাখেন তাঁদের মধ্যে আহমাদ ইবনু ইরফান বেরেলভী (মৃঃ ১৮৮৬ ঈ.) অন্যতম। তাঁর মাধ্যমে এই দাওয়াত ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। তিনি 'রায়বেরেলী' শহরে (১৮৩১ ঈ.) জন্ম গ্রহণ করেন এবং পরিণত বয়সে সৈনিক বিভাগে যোগদান করেন। চার বছর চাকুরী করার পর চাকুরী ছেড়ে দিয়ে দিল্লীতে চলে আসেন। ভারতে তখন বৃটিশ উপনিবেশ শাসনের যাঁতাকলে মুসলিম জাতি পিষ্ট। এ কারণে তারা ইসলামের সঠিক পথ থেকে দূরে সরে গিয়ে নানা প্রকার বিদ'আত, কুসংস্কার, কবর পূজা ও হিন্দু আকীদাহ বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠা সামাজিক প্রথার মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। মুসলিমদের এ দুরবস্থা নিরসনের জন্য তিনি ব্যাপকভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করেন।

অনুরূপভাবে শায়খ মুহাম্মাদের দাওয়াতের অনুসরণে ভূপালের স্বনামধন্য নওয়াব আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান (১২৪৮ - ১৩০৭ হিঃ/ ১৮৩২ - ১৮৯০ ঈ.) দাওয়াতী কাজের সূচনা করেন। ১৮৬৮ ঈ. হাজ্জে গিয়ে সেখানকার শায়খ মুহাম্মাদের অনুসারী খ্যাতনামা আলিমদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। বিশেষ করে আল্লামা হামাদ ইবনু আতীক্ব (মৃঃ ১৩০১হিঃ/ ১৮৮৩ঈ.) তাঁকে ইমাম ইবনু তাইমিয়া (মৃঃ ৭২৮ হিঃ/ ১৩২৮ঈ.) ও হাফিয ইবনুল কাইয়্যেম (মৃঃ ৭৫১হিঃ/ ১৩৫০ ঈ.) এর আকীদাহ সংক্রান্ত কিতাবসমূহ

৬৪. ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ গালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৬, ২৬৭।

অধ্যয়নের উপদেশ দেন। দেশে ফিরে তিনি দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করেন। এ কারণে হিংসুক ও শত্রুগণ তাঁকে ওয়াহহাবী চিন্তা চেতনা ভারতে ছড়ানোর অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। তিনি হাদীছ, ফিকহ ও অন্যান্য বিষয়ের উপর অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী বই রচনা করেন। এবং অনেক দুর্লভ বই পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশ করে বিলি বিতরন করেন।[৬৫]

তাছাড়া মুসলিম দার্শনিক ও ইসলামী জাগরণের কবি আল্লামা মুহাম্মাদ ইকবাল (মৃঃ ১২৮৯হিঃ/ ১৯৩৮ ঈ.) শায়খ মুহাম্মাদের দাওয়াত ও চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে সংস্কারধর্মী কাজ শুরু করেন।

একইভাবে ভারত উপমহাদেশের অন্যতম সেরা ইসলামী আন্দোলনের রূপকার সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদীর (মৃঃ ১৯৭৯ঈ.) লেখনী পড়ে বুঝা যায়, তিনিও শায়খের চিন্তাধারা, দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। যদিও তিনি শায়খ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের আকীদাহগত বিষয়গুলোর মতো আকীদাহকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেননি, তবে তাঁর মৌলিক চিন্তার সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে। তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামী রেনেসাঁ ও পুনর্জাগরণে তাঁর চিন্তা ও ক্ষুরধার লেখনীকে কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর চিন্তাধারাতে তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, কালেমায়ে শাহাদাতের ব্যাখ্যা, এর দাবীসমূহ তুলে ধরেছেন। প্রচলিত শিরক, বিদ'আত, কবর পূজা, হিন্দুয়ানী রসম রেওয়াজের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। প্রয়োজনীয় ইজতিহাদের দিকে আহবান করেছেন। অন্ধ অনুকরণ ও তাকলীদ নিরুৎসাহিত করেছেন। সর্বোপরি নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফাত প্রতিষ্ঠার জন্য সামগ্রিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচী পেশ করেছেন। তিনি শায়খ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের মতোই দীন ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য করেন নি। দীনকে পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সুসংগঠিত, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি জামা'য়াত কায়েম করেছেন। যে জামা'য়াত দাওয়াত, তাবলীগ, তানযীম ও তারবিয়াত, সমাজ সংস্কার ও রাষ্ট্রীয় সংস্কার সাধন করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

তিনঃ বাংলাদেশঃ

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের দাওয়াত ও সংস্কার কর্মের ধারায় ভারতবর্ষের বিখ্যাত আলিমগণের মাধ্যমে বর্তমান বাংলাদেশে কাজ শুরু হয়। ঐ সকল দায়ী'দের মাধ্যমে বাংলাদেশে বহুসংখ্যক মানুষ ইসলামে প্রবেশ করে। তাঁদের মাধ্যমেই উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে এ দাওয়াতী কাজের গতি বৃদ্ধি পায়। এ সকল আলিম ও দায়ীদের মূল লক্ষ্য ছিল মুসলিমদেরকে তাদের হিন্দুয়ানী আকীদাহ বিশ্বাস, কুপ্রথা ও রসম রেওয়াজ থেকে মুক্তি দেয়া এবং এতদঞ্চলে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটানো। এ সকল আলিমগণের অধিকংশই নজদ ও হিজাযের সালাফী দাওয়াতের শায়খদের

---

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫০। বুহুছ নাদওয়াতে দাওয়াতিশ শায়খ, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩২১।

নিকট থেকে ইলমে দীন শিক্ষা লাভ করেছেন এবং সে অনুযায়ী নিজেদের দেশে খাঁটি ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন ও সংস্কার কার্য পরিচালনা করেছেন। তাঁদের অন্যতম হলেন সাইয়্যেদ নিছার আলী ওরফে তীতুমীর (১৭৮২ – ১৮৩১ঈ.)। তিনি পশ্চিম বংগের ২৪ পরগনা জিলার চাঁদপুর এলাকাতে ১৭২৮ ঈ. জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মীর হাসান আলী, মাতা আবিদাহ রুকাইয়্যা খাতুন। ছোট কালেই নিজ এলাকাতে বিদ্যা অর্জন করেন। এ সময় তিনি কুরআন হিফয সহ হাদীছ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পাঠ গ্রহণ করেন। উচ্চতর শিক্ষার জন্য তিনি কলকাতা ও দিল্লীতে গমন করেন। পরে তিনি ১৮২৩ ঈ. হাজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। সেখানে ৩/৪ বছর অবস্থান করেন। এ সময় তিনি হাজ্জ আদায়ের পাশাপাশি সেখানকার আলিমদের নিকট দীনী ইলম অর্জন করেন এবং শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের দাওয়াত ও সংস্কার কর্মসূচীর সাথে পরিচিত হন। তিনি ১৮২৭ ঈ দেশে ফিরে দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। কবর পূজা ও নযর নেয়ায, হিন্দুয়ানী পোশাক পরিধান, দাড়ি মুন্ডানো ও অন্যান্য অনৈসলামী রসম রেওয়াজের বিরুদ্ধে সংস্কার কার্যক্রম শুরু করেন। তাঁর সংস্কার কর্মসূচী সম্পর্কে প্রখ্যাত ইসলামী ইতিহাসবিদ ড. মুহাম্মাদ মোহর আলী বলেনঃ "Titu Mir called upon the Muslims of his locality to adhere strictly to the principle of tawhid and to abandon all practices that savoured of shirk or setting partnership with Allah. Thus he inveighed against the practice of showing reverence to pirs and invoking their influence in spiritual or wordly affairs. Likewise he denounced the practice of paying homage to tombs or shirnes of the ancients called dargahs. Titu Mir asked his followers to discontinue all un-Islamic innovations (bid'a) such as extravagant cermonies in connection with birth, marriage, death, the Ids and the Muharram".[66]

স্বনামধন্য আরেকজন দায়ী' ও সংস্কারক হলেন হাজী শরীয়াতুলাহ (মৃঃ ১২৫৬ হিঃ/ ১৮৪০ ঈ.)। তিনি ১২১৪হিঃ/ ১৮০২ঈ. মক্কায় হাজ্জ আদায় করতে গিয়ে সেখানকার আলিমদের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন এবং তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। তিনি দাওয়াতী কর্মকে ব্যাপকতা দানের উদ্দেশ্যে ১৮০৪ ঈ. 'ফারায়েজী আন্দোলন' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। যে সংগঠনের মূল লক্ষ্য ছিল সমাজ থেকে শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কার দূর করা এবং বৃটিশ বেনিয়াদের অপশাসন থেকে মুসলিম জাতিকে মুক্তি দেয়া।

---

৬৬. Dr. Muhammad Mohar Ali, History of the Muslim of Bengal, Al Imam University, 1st Edition, vol. 2 A, p. 252. এবং ড. মুহাম্মাদ আসাদুলাহ গালিব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১৭।

হাজী শরীয়াতুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে দুদু মিয়া (মৃঃ১৮৬০ঈ.) 'ফারায়েজী আন্দোলনকে' পুনর্জীবিত করেন। তারপর তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই আন্দোলন দৃশ্যতঃ দুর্বল হয়ে পড়লেও এর প্রভাব প্রতিটি ইসলামী আন্দোলনের উপর রয়েছে।[৬৭]

চারঃ ইন্দোনেশিয়াঃ

শায়খ মুহাম্মাদের দাওয়াত সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় প্রসার লাভ না করলেও সবচেয়ে বড় দ্বীপ হিসাবে পরিচিত 'সুমাত্রা' ও এর আশে পাশের দ্বীপগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। মূলতঃ শায়খের দাওয়াত এই দ্বীপে সেখানকার অধিবাসী তিনজন ব্যক্তির মাধ্যমে ১৮০৩ ঈ. সনে পৌঁছে। তাঁরা পবিত্র মক্কা নগরীতে হাজ্জ পালন করতে আসেন। ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের দাওয়াতের অনুসারী সেখানকার বড় বড় আলিম ও শায়খদের সান্নিধ্য লাভ করেন। তাঁদের নিকট থেকে দীনী ইলম শিক্ষা করেন। নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াতের কর্মসূচী দেখে তাঁরা অনুপ্রাণিত হন এবং দেশে ফিরে এসে সুমাত্রাতে দাওয়াতের কাজ শুরু করেন। তাওহীদের প্রচার, প্রতিষ্ঠিত শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। অল্প দিনের মধ্যেই বহুসংখ্যক লোক তাঁদের আন্দোলনে শরীক হয়। ফলে এই আন্দোলনের কর্মী ও অমুসলিমদের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ইন্দোনেশিয়াতে তখন হল্যান্ডিয় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারা নিজেদের শাসনের পথে এই আন্দোলনকে বড় বাধা মনে করে। ১৮২০/ ১৮২১ঈ. হল্যান্ড সরকার এই শক্তিশালী আন্দোলনের মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর মাধ্যমে ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের দাওয়াতের অনুসারীদের 'দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের' কর্মীদের সাথে হল্যান্ডিয়দের যুদ্ধ শুরু হয় যা দীর্ঘ প্রায় ১৬ বছর অব্যাহত থাকে। অতঃপর এই পবিত্র দাওয়াতের অনুসারীদের পরাজয়ের ফলে সুমাত্রাতে দাওয়াতের প্রভাব কিছুটা হলেও হ্রাস পায়। এতদ সত্ত্বেও দাওয়াতের অনুসারীগণ তাঁদের মিশনকে বন্ধ না করে গোপনে গোপনে চালু রাখেন এবং দাওয়াতের সুফল প্রত্যেকের নিকট পৌঁছে দেন। সেই ধারাবাহিকতায় ১৩৪৪ হিঃ বাদশাহ আব্দুল আযীয আল সউদের হিজায দখলের সময়ও অনেকেই সুমাত্রা, জাওয়াহ এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপ থেকে দীনী ইলম অর্জন করার জন্য মক্কা মদীনায় গমন করেন। সেখান থেকে ফিরে তাঁরা প্রত্যেকেই সঠিক তাওহীদের প্রচার, শিরক বিদ'আত ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করেন।[৬৮]

পাঁচঃ তুর্কিস্তানঃ

১২৮৮ হিঃ/১৮৭১ ঈ. পশ্চিম তুর্কিস্তানের কাওকান্দের সূফী বাদাল কাওকান্দি নামক

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৯, ৩২০, এবং মুহাম্মাদ আল সালমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৩।
৬৮. টমাস আরনল্ড, আল দাওয়াহ ইলা আল ইসলাম, তরজমাঃ ড. হাসান ও অন্যান্য, ২য় সংস্করণ, ১৯৭০ঈ. পৃঃ ৩১৫, ৪১০ এবং আহমাদ আব্দুল গফুর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১০।

একজন দায়ী' দাওয়াতী কাজ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি শায়খ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের দাওয়াতী কাজ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সেখানকার মুসলিমদের মাঝে অনুরূপ দাওয়াতী কাজ শুরু করেন। তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন। তাঁর নেতৃত্বে তাঁর অনুসারীগণ তাশখন্দের নিকটবর্তী এক স্থানে রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। কিন্তু শক্তিশালী রাশিয়া বাহিনীর নিকট রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরাজিত হলে প্রকাশ্যে দাওয়াতের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। দাওয়াতী কাজ তখন গোপনে গোপনে সীমিত আকারে পরিচালিত হয়।[৬৯]

ছয়ঃ গণ চীনঃ

১৩১১ হিঃ / ১৮৯৪ ঈ. চীনের 'ফালসু' এলাকাতে শায়খ নুহ মাকুউয়ান নামক একজন দায়ী' ইলাল্লাহ আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি হাজ্জে এসে শায়খ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের দাওয়াতের অনুসারী হয়ে পড়েন। দেশে ফিরে গিয়ে সঠিক ইসলামের দিকে মানুষদেরকে ফিরে আসার দাওয়াত দেন। খাঁটি তাওহীদের শিক্ষা দেন। শিরক ও বিদ'আত থেকে মানুষদেরকে সতর্ক করেন ও সমাজ সংস্কারের কাজ শুরু করেন। এ কাজে তাঁর অনেক অনুসারী জুটে যায়। তিনি তাদেরকে নিয়ে ' ইখওয়ান' নামে একটি সংগঠন কায়েম করেন। সংস্কারমূলক কাজে এ সংগঠন অনেক বড় ভূমিকা রাখে। ১৯৪৯ ঈ. চীনে কমিউনিষ্ট শাসন কায়েম না হওয়া পর্যন্ত এই সংগঠন তৎপরতা অব্যাহত রাখে এবং সমাজে দীনী সংস্কারের ক্ষেত্রে অনেক বড় অবদান রাখে।[৭০]

আফ্রিকা মহাদেশে দাওয়াতের প্রভাবঃ

এশিয়া মহাদেশের মতো আফ্রিকা মহাদেশের ছোট বড় সকল দেশেই যে শায়খ মুহাম্মাদের দাওয়াতের আছর পড়েছে তা নয়, তবে যে সব দেশে ইসলামের এ খাঁটি দাওয়াতের প্রভাব পড়েছে সেখানে পরিচালিত সকল দীনী দাওয়াতী সংস্থা ও সকল আন্দোলনের উপরই এই দাওয়াতের বিরাট প্রভাব পড়েছিল। বিশেষ করে এ আন্দোলন খাঁটি তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেয়া, শিরক, বিদ'আত, ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতন করা, ইজতিহাদে উদ্বুদ্ধ করা এবং অন্ধ তাকলীদ না করার দিকে আহবান করার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখেছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু দেশের কথা উল্লেখ করা হলো, যেখানে শায়খের দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল।

একঃ মিশরঃ

শায়খ মুহাম্মাদ রশীদ রেযা (১২৮২ – ১৩৫৪হিঃ/ ১৮৬৫ – ১৯৩৫ঈ.) এবং তাঁর

৬৯. কামাল সাইয়্যেদ দরোবীশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫০।
৭০. মুহাম্মাদ আল সালমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৬।

'আল মানার' ম্যাগাজিনকে মিশরে শায়খ মুহাম্মাদের দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হিসাবে মনে করা হয়। এ ম্যাগাজিনের পাশা পাশি তিনি অনেক বইও রচনা করেছেন। তিনি এ বইগুলোতে এই আন্দোলনের আদর্শ, কর্মসূচী এবং এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য সবিস্তারে তুলে ধরেন। যেমনঃ 'আল ওয়াহহাবীউন ওয়াল হিজায',(الوهابيّون والحجاز) 'আল সুন্নাহ ওয়া আল শারীয়া'হ আও আল ওয়াহ্হাবিয়্যাহ ওয়া আল রাফিযাহ', (السنّة والشريعة أو الوهابيّة والرافضة) এবং 'আল মানার ওয়া আল আযহার', (المنار والأزهر) ইত্যাদি। তাছাড়া আরো কতিপয় 'ইসলামী সংস্থা' শায়খের দাওয়াত দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে। যেমনঃ 'জামইয়্যাতু আনসার আল সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়্যাহ' (جمعيّة أنصار السنّة المحمّديّة)। এ সংস্থার চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ হামিদ আল ফিকী আরব উপসাগরীয় অঞ্চলের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের প্রভাবের উপর আরবীতে একটি বইও লেখেছেন। তাছাড়া এ সংস্থা ' আল তাওহীদ' নামক মাসিক একটি পত্রিকাও বের করে।

দুইঃ লিবিয়াঃ

উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে সংস্কার মূলক দাওয়াত লিবিয়াতে শক্ত স্থান করে নেয়। এ সংস্কার ও দাওয়াতী আন্দোলনের নেতা ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনু আলী আল সানুসী (১২০২ – ১২৭৬হিঃ/ ১৭৮৭ – ১৮৫৯ঈ.)। তাঁর নামানুসারেই এ সংগঠনের নামকরণ করা হয় 'আদ্ দাওয়াহ আল সানুসিয়্যাহ'। তিনি ১২৫৩হিঃ/১৮৩৭ঈ.) হাজ্জ ব্রত পালনের উদ্দেশ্যে হিজাযে আগমন করেন এবং মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের অনুসারী আলিমগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁদের দাওয়াতী কর্মকান্ডে অনুপ্রাণিত হন এবং তাঁদের দাওয়াতের কর্মসূচী অনুযায়ী নিজের দাওয়াতী সংগঠনের কর্মসূচী স্থির করেন। সেই কর্মসূচী হলোঃ নির্ভেজাল তাওহীদ তথা এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করা। সকল প্রকার বিদ'আত ও কুসংস্কার – যেমনঃ নেক লোকদের উসীলা করা – থেকে দূরে থাকা। ইজতিহাদের দিকে উদ্বুদ্ধ করা এবং অন্ধ তাকলীদ থেকে সতর্ক করা। তবে এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, শায়খ আল সানুসীর 'সানুসী দাওয়াতের' নেতিবাচক দিক যা শায়খ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের দাওয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক তা হলো 'সানুসী দাওয়াতের' মধ্যে সূফীবাদের কিছুটা প্রভাব আছে।[৭১] সে যাই হোক এই সংগঠন ও এর ত্যাগী কর্মীদের বলিষ্ঠ ও নির্ভীক ভূমিকার ফলে ইটালী ও ফ্রান্সের উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। তবে যুদ্ধে তাদের পরাজয় ঘটে। তারা দেশ থেকে বিতাড়িত হয়। এই সংগঠনের জানবায কর্মী ছিলেন শহীদ 'উমার আল মুখতার'।

৭১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৯।

তিনঃ আলজিরিয়াঃ

আলজিরিয়ায় আব্দুল হামিদ ইবনু বাদীস (১৩০৫ – ১৩৫৯হিঃ/ ১৮৮৭ – ১৯৪০ঈ.) এর নেতৃত্বে পরিচালিত "জামইয়্যাত আল উলামা আল মুসলিমীন", (جمعية العلماء المسلمين) (মুসলিম উলামা সংস্থা) এই আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। আবদুল হামিদ ইবনু বাদিস হাজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করলে ইসলামী দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের কর্মসূচী সম্পর্কে ধারণা অর্জন করেন। ইবনু বাদিস এই আন্দোলনের কর্মসূচী অনুযায়ী নিজের দলের কর্মসূচী ঠিক করেন। অর্থাৎ আলজিরিয়ার মুসলিমদের আকীদাহ বিশ্বাসকে পরিশুদ্ধ করে খাঁটি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা, শিরক, বিদ'আত ও অপসংস্কৃতির বিলোপ সাধন, ইজতিহাদের দিকে অনুপ্রাণিত করা এবং চিন্তার বিকলাঙ্গতা ও অন্ধ তাকলীদ দূর করা, কুরআন কারীম ও সুন্নাহর গবেষণা করা। তাছাড়া ফ্রান্সীয় উপনিবেশ এর বিরুদ্ধে খেদাও আন্দোলনে এ সংগঠনের বিরাট অবদান রয়েছে। ফলশ্রুতিতে ১৩৮২হিঃ/ ১৯৬২ঈ. আলজিরিয়া ফ্রান্স থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।[৭২]

চারঃ তিউনিসিয়াঃ

শায়খ খায়ের উদ্দীন পাশা আল তিউনিসী. (প্রায় ১২২৫ – ১৩০৭হিঃ / ১৮১০ – ১৮৭৯ঈ.) শায়খ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের চিন্তা চেতনা দ্বারা শিক্ষা, চিন্তার পরিশুদ্ধি এবং মুসলিম জাতি ও মুসলিম বিশ্বের সমস্যা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। তিনি সরকারের বড় বড় দায়িত্বে ছিলেন। তিনি সার্বিকভাবে মুসলিম সমাজের সংস্কারের দিকে নযর দেন। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত দুর্বলতাগুলোর সংশোধনের উদ্যোগ নেন। সংশোধন করতে না পারলে হাত তুলে মুনাজাত করে আল্লাহ তাআ'লার নিকট ফরিয়াদ করে বলতেন, হে আল্লাহ, আমি তাদের নিকট সত্য পৌঁছে দিয়েছি।[৭৩]

পাঁচঃ সুদানঃ

পূর্ব সুদানে (বর্তমান সুদান) মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আহমাদ (১৮৪৫ – ১৮৮৫ ঈ.) এর নেতৃত্বে 'মাহদী সংস্কার আন্দোলন' নামে সার্বিক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা হয়। তিনি নিজেকে ইমাম মাহদী দাবী করেন। তাঁর দাওয়াতী কর্মসূচীর মধ্যে শিরক, বিদ'আত এবং ফিৎনা ফাসাদ দূর করে ইসলামকে তার আসল সূরতে প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা ছিল। তাঁর দাওয়াতের মধ্যে সূফীবাদ ও মাহদী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার দাওয়াতও ছিল। তাছাড়া বৃটেনের উপনিবেশ শাসনের অবসান করার জন্য তিনি জিহাদের ডাক দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে সুদান থেকে বিতাড়িত করেছিলেন।

সার্বিক বিচারে এই মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আহমাদ কর্তৃক পরিচালিত 'মাহদী সংস্কার আন্দোলনকে' সার্বিকভাবে শায়খ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের দাওয়াত দ্বারা প্রভাবিত

---

৭২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৯ – ৯০।

৭৩. বুহুছ নাদওয়াতে দাওয়াতিশ শায়খ, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩২১।

বিবেচনা করার সুযোগ নেই। তবে তাঁর কর্মসূচীর দুটি বিষয়কে সামনে রেখে বলা যায় যে, এই আন্দোলনের উপরেও ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের দাওয়াতের সামান্য হলেও প্রভাব পড়েছিল। তাঁরা একদিকে শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কার থেকে সুদানবাসীকে মুক্তি দেয়ার চেষ্টা করেছেন, অপরদিকে শায়খ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের দাওয়াতের মতো দীন ও রাষ্ট্রকে একত্রিত করার কর্মসূচী গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ফলে ইংরেজ খেদাও আন্দোলন অতঃপর জিহাদের মাধ্যমে বৃটিশ উপনিবেশ থেকে সুদানকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৭৪]

অন্যদিকে পশ্চিম সুদানে সেখানকার আল ফূলান গোত্রের শায়খ উছমান দানফূদিয়ো(১২৩১ হিঃ/ ১৮১৬ঈ.) এর মাধ্যমে শায়খ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের দাওয়াতী কার্যক্রম চালু হয়। শায়খ উছমান মক্কায় হাজ্জব্রত পালন করতে গিয়ে এই সংস্কার মূলক আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হন। দেশে ফিরে তিনি সে অনুযায়ী দাওয়াতী কাজ শুরু করেন। সেখানে মূর্তি ও মৃত মানুষ পূজার প্রচলন ব্যাপকভাবেই ছিল। তিনি তাদেরকে সঠিক আকীদাহ বিশ্বাস ও বিশুদ্ধ ইসলামের দিকে আহবান জানান। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর গোত্রের প্রায় সকল লোকই এ দাওয়াত কবুল করে। তিনি তাদেরকে নিয়ে একটি শক্তিশালী ও মজবুত সংগঠন কায়েম করেন এবং ১২১৭ হিঃ/ ১৮০২ ঈ দাওয়াতী কাজ শুরু করেন। তিনি মূর্তি পূজারী 'হাওসা' গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তাছাড়া নাইজার নদী সংলগ্ন যোবায়ের রাজত্ব দখল করে নেন। দু বছরের মধ্যেই তিনি 'সুকটো নামে একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন। যার পরিধি ছিল চার লক্ষ বর্গকিলোমিটার। আর জনসংখ্যা ছিল দশ মিলিয়ন।

১২৩১ হিঃ/ ১৮১৬ঈ. শায়খ উছমানের মৃত্যু হলেও 'সুকটো রাষ্ট্র' টিকে থাকে এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়ে পূর্বে 'আদমাওয়া' শহর এবং দক্ষিণ পশ্চিমে 'ইলওয়ান" শহর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। এ রাষ্ট্রের মাধ্যমে আফ্রিকার ঐ অঞ্চলে ইসলামের সঠিক আকীদাহর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে। যদিও বৃটেনের উপনিবেশের ফলে এই দাওয়াতের প্রভাব শিথিল হযে পড়ে। তখন এ দাওয়াত খুব সীমিত আকারে গোপনে গোপনে চলতে থাকে।[৭৫]

এভাবে সকল বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে শায়খ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের দাওয়াতের ধারাবাহিকতা অব্যাহতভাবে চালু আছে। মুসলিম জনশক্তি অবিচল পাথরের মতো ইসলামের মহান আদর্শের উপর টিকে থেকে ক্রুসেডের সর্বশক্তির মুকাবিলা করে যাচ্ছে। তাই বলা যায়, আফ্রিকা মহাদেশ 'ইসলামের মহাদেশ' হিসাবে আত্মপ্রকাশের জন্য একটু সময়ের অপেক্ষায় আছে ইনশা আল্লাহ।

---

৭৪. মুহাম্মাদ আল সালমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯০ – ৯২।

৭৫. স্টুডার্ড, সাকিব আরসালান, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩০২।

শায়খ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনে নারীদের ভূমিকাঃ

শায়খ মুহাম্মাদের দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলন ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছিল বলে এই আন্দোলনের কর্মী, সদস্য ও সাহায্যকারী হিসাবে অনেক মহিলাও অংশ গ্রহণ করেন।[৭৬] উদাহরণস্বরূপ কতিপয় মহিয়সী নারীর কথা এখানে উল্লেখ করা হলো, যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই আন্দোলনের সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেনঃ

১) গালিয়াতুল বাকূমিয়াহঃ যিনি 'তুসুন ইবনু মুহাম্মাদ আলী পাশা ও শায়খের দাওয়াতের অনুসারীদের মধ্যে ১২২৯ হিঃ/ ১৮১৩ঈ. সংঘটিত 'তুরবার' যুদ্ধে মুজাহিদদের পক্ষে নিজের বাহিনী নিয়ে বীরত্বের সাথে লড়াই করেছিলেন। তাছাড়া তিনি ১২৩০ হিঃ 'বাসাল' যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করার পর পরাজিত হয়ে দারঈয়্যাতে পালিয়ে আসেন। তাঁকে পাকড়াও করার জন্য মুহাম্মাদ আলী পাশা ভীষণ আগ্রহী ছিলেন। তিনি শায়খের দাওয়াতপন্থীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের প্রমাণ স্বরূপ এই বীর যোদ্ধা মহিলাকে পাকড়াও করে 'কনস্ট্যান্টিনোপলে' পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সে আশা পূরণ হয়নি।

২) সাইয়্যেদাহ লুলু বিনতু আবদির রহমান আলে আ'রফাজঃ তিনি বর্তমান সউদী আরবের 'আল কাসীম' অঞ্চলের গভর্ণরদের বংশের ছিলেন। তিনিও শায়খের দাওয়াতের পক্ষে কাজ করেছেন।

৩) আমীর মুহাম্মাদ ইবনু সউদের স্ত্রী মাওযা বিনত ইবনু আবি ওয়াহতানঃ ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শায়খ মুহাম্মাদ ১১৫৭ হিঃ সনে বাধ্য হয়ে 'উয়াইনাহ' থেকে যখন 'দারঈয়্যাতে' স্থানান্তরিত হন তখন আমীর মুহাম্মাদের দুই ভাই 'ছানইয়ান' ও 'মিশারী'র অনুরোধে আমীরের এই স্ত্রী তাঁর স্বামীকে শায়খ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবকে স্বাগত জানানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। কারণ তিনি তাঁর তাওহীদের দাওয়াত ও সংস্কার কর্মের কথা শুনে তা মনে প্রাণে গ্রহণ করেন এবং স্বামীকে কাল বিলম্ব না করে এই দাওয়াতের ইমামকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য জোর তাকীদ করেন। স্ত্রীর কথা মতোই মুহাম্মাদ ইবনু সউদ শায়খ মুহাম্মাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর হাতে বাই'য়াত হন যে, তিনি তাঁর কাজে সার্বিকভাবে রাষ্ট্র শক্তি নিয়ে সাহায্য করবেন । এভাবে দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের নেতা এবং

৭৬. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ 'আল মারআতু ফী হায়াতি ইমাম আল দাওয়াহ', (গবেষণা প্রবন্ধ, লেখকঃ শায়খ হামাদ আল জাসির), প্রকাশিত হয়েছে "বুহুছ নাদওয়াতে দাওয়াতিশ শায়খ", প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৫৯ – ১৮৮।

রাষ্ট্র নায়কের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতার চুক্তি হয়। তাঁরা একে অপরের কাজে সহায়তা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।[৭৭]

৪) আমীর মুহাম্মাদ ইবনু সউদের কন্যাঃ কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, শায়খ মুহাম্মাদ দারঈয়্যাতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর 'উয়াইনার' শাসক উছমান ইবনু মা'মার দারঈয়্যার উপর আক্রমণ করেন। সে সময় মুহাম্মাদ ইবনু সউদের কন্যা কবিতার মাধ্যমে শায়খ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের দাওয়াতের পক্ষে কথা বলেন এবং এর সংরক্ষণের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তবে কোন ঐতিহাসিকই এই মহিয়সী নারীর নাম উল্লেখ করেননি। যদিও কোন কোন গবেষক এ বিষয়টির উপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।[৭৮]

৫) শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের স্ত্রী ঃ জাওহারা বিনতু আবদিল্লাহ ইবনু মা'মার। শায়খ মুহাম্মাদ 'উয়াইনাতে' গমন করার পর সেখানকার শাসক উছমান ইবনু মা'মার তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাঁর দাওয়াত কবুল করে তাঁকে সার্বিক সহযোগিতা করেন। তাঁর সাথে সুসম্পর্কের কারণে তিনি নিজের ভাতিজীকে শায়খের সাথে বিয়ে দেন। বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে শাসক পরিবারের সাথে শায়খের সম্পর্ক খুব গভীর হয়, যা তাঁর দাওয়াতী কাজে বড় রকমের শক্তি যোগায়। উয়াইনাতে থাকা কালে তাঁর সহযোগিতায় শায়খ অনেক বিদ'আতের মূলোৎপাটন করতে সক্ষম হন। বিশেষ করে যায়িদ ইবনুল খাত্তাবের (রা) কবরের উপর নির্মিত গম্বুজ ভাঙ্গার কাজে উছমান জনবল দিয়ে শায়খকে সাহায্য করেন। শুধু তাই নয় একটি শাসক পরিবারে বিয়ের ফলে দারঈয়্যার শাসক পরিবারের সাথে যোগ সূত্র স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। স্ত্রী জাওহারার সহযোগিতায় শায়খ ব্যাপকভাবে দাওয়াত প্রসার ঘটাতে সক্ষম হন।

৬) শায়খ মুহাম্মাদের 'শাইআ' ও 'হায়া' নামক দুজন কন্যা ছিল। তাদের একজনের বিয়ে হয়েছিল বাদশাহ আব্দুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সউদের সঙ্গে। আর দ্বিতীয় কন্যার প্রথমে বিয়ে হয় বিখ্যাত শায়খ হামাদ ইবনু ইবরাহীম এর সঙ্গে। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু গারীরের সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয়। শায়খের কন্যাদের স্বামীগণ সকলেই শায়খের দাওয়াতের অনুসারী, সাহায্যকারী এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

৭৭. ইবনু বিশর, উনওয়ানুল মাজদ, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৪।
৭৮. বুহুছ নাদওয়াতে দাওয়াতিশ শায়খ, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৬৬ – ১৬৮।

নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় শায়খ ইবনু আবদিল ওয়াহ্হাবের অবদানঃ

সত্যপন্থী ও বিবেকবান মানুষদের নিকট 'ইসলামে নারী পুরুষের ভারসাম্যপূর্ণ ন্যায্য অধিকার রয়েছে' এ কথা বলার প্রয়োজন পড়ে না। পৃথিবীকে আল্লাহর বিধান দিয়ে গড়ার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের দায়িত্ব কর্তব্য সমান। তাই ইসলাম প্রতিষ্ঠার যে কোন আন্দোলন নারী জাতিকে উপেক্ষা করতে পারেনা। হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ, আল্লাহর দীনকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী, সংস্কার আন্দোলনের নেতা শায়খ মুহাম্মাদও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদান রেখেছেন। এ কাজটিও তাঁর মিশনের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল। নারী জাতির প্রতি ইনসাফ কায়েম ও তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। সে যুগে কিছু চতুর মানুষ 'ওয়াকফ', হেবা বা দান, বন্টননীতিতে ছল চাতুরীর মাধ্যমে নারীদেরকে বঞ্চিত করার অপকৌশল গ্রহণ করতো। শায়খ তাঁর লেখা এক পত্রে বিষয়টিকে এভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেনঃ " যদি কোন মানুষ আল্লাহর বন্টননীতি পরিহার করে নিজের ইচ্ছামতো তার সম্পদ বন্টন করে, যেমনঃ স্ত্রী এই খেজুর বাগানের ওয়ারিশ হবেনা, তার স্বামীর জীবদ্দশা ছাড়া খেতে পারবেনা, অথবা কোন সন্তানকে প্রাধান্য দেয় কিংবা মেয়েদেরকে বঞ্চিত করে, আর কোন মুফতি সাহেব তাকে ফতোয়া দিয়ে দেয় যে, এই 'অভিশপ্ত বিদ'আতটি' একটি নেকীর কাজ, যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হবে এবং এভাবে ওয়াকফ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে"। অতঃপর তিনি এ কর্মটিকে সাংঘাতিক গুনাহর কাজ হিসাবে আখ্যায়িত করে ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং এ কাজটি যে সম্পূর্ণ শরীয়াত বিরোধী তার সপক্ষে বহু দলীল ও প্রমাণাদি পেশ করেন।[৭৯]

দেশের ভেতরে ও বাইরে আন্দোলনের বিরোধিতাঃ

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহ্হাবের সংস্কার আন্দোলন অন্য যে কোন সত্যপন্থী আন্দোলনের মতো নিজ দেশ ও দেশের বাইরে থেকে নানাবিধ বাধা বিপত্তি ও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। সর্ব প্রথম এ আন্দোলন নিজ দেশেই তোপের মুখে পড়ে। তথাকথিত আলিম নামধারী কিছু লোক এ আন্দোলনের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শায়খ মুহাম্মাদের কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক দাওয়াতের ফলে এ সব আলিমদের প্রকৃত চেহারা জন সম্মুখে প্রকাশিত হয়ে পড়লে তাদের স্বার্থ বিনষ্ট হবে এবং তারা মহা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, তাই তাঁরা এই দাওয়াতকে কঠোর সমালোচনা, মিথ্যা অপবাদের মাধ্যমে কোনঠাসা করতে চেষ্টা করেন। এবং এর বিষ বাষ্প এখানে ওখানে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে ঘৃণা সম্বলিত চিঠি পত্র উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম চতুর্দিকে পাঠাতে শুরু করেন। সউদী আরবের সাবেক গ্রান্ড মুফতী বিশ্ব বরেণ্য আলিম শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল আযীয (রহঃ) এই আন্দোলনের বিরোধী পক্ষকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেনঃ

---

৭৯. বুহুছ নাদওয়াতে দাওয়াতিশ শায়খ, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৬২।

১. বিভিন্ন কুসংস্কারে আসক্ত ও আকণ্ঠ নিমজ্জিত উলামা ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। তাঁরা সত্যকে বাতিল এবং বাতিলকে সত্য হিসাবে দেখেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, কবরের উপর সমাধি ও মসজিদ তৈরী করা এবং আল্লাহকে ছেড়ে কবরবাসীদের ডাকা, তাদের সান্নিধ্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করা ইত্যাদি দীন ও হিদায়াতের কাজ। তাঁরা আরো বিশ্বাস করেন যে, এ জাতীয় কাজ যারা অস্বীকার করে তারা প্রকৃত পক্ষে নেক লোক ও ওলীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।

২. আরেক দল হলো, যাঁরা ছিলেন ইলমে দীনের দাবীদার। তাঁরা শায়খ মুহাম্মাদের দাওয়াতের প্রকৃত হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। তিনি যে সত্যের দিকে আহবান করেছিলেন সেই সম্পর্কে তাঁরা সঠিকভাবে অবগত ছিলেন না। বরং তাঁরা অন্যদের অন্ধ অনুসরণকারী ছিলেন এবং কুসংস্কারপন্থী ও ভ্রান্ত লোকদের কথা সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে, তাঁরা নিজেরা হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে তাঁরা শায়খ মুহাম্মাদের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেন এবং তাঁর দাওয়াতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতঃ ঘৃণা ভরে দূরে সরে থাকেন।

৩. অন্য এক দল হলো, যাঁরা আপন আপন পদ ও মর্যাদা হারানোর ভয়ে আতঙ্কিত ছিলেন। সুতরাং তাঁরা তাঁদের এই স্বার্থের খাতিরে শায়খ মুহাম্মাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠেন, যাতে ইসলামী দাওয়াতপন্থীদের হাতে তাঁদের পদমর্যাদার বিনাশ সাধিত না হয় এবং দেশের কর্তৃত্ব এরা দখল করে না নেয়।[৮০]

পরবর্তীতে কতিপয় আলিম এই সংস্কারমূলক দাওয়াতের কঠিন ভাবে বিরোধিতা শুরু করেন। কিন্তু সংস্কার আন্দোলন সউদী আরবের সউদ পরিবারের মাধ্যমে সরকারী আনুকূল্য পাওয়ার ফলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সউদ পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সউদী রাষ্ট্র তাওহীদী রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। তখন সউদী সরকারের হাতে একের পর এক অঞ্চল পরাজিত হয়ে সউদী রাষ্ট্রের অধীনে চলে আসে। ফলে শায়খের দাওয়াতের বিরোধীরা এই রাষ্ট্রে সুবিধা করতে না পেরে অন্য এলাকায় চলে যায় এবং বিভিন্ন এলাকা ও দেশে দেশে চিঠি পত্রের মাধ্যমে শায়খ মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে অনেক অপবাদ ছড়িয়ে দেয়। এই ধরণের বিশিষ্ট কয়েকজন আলিমের মধ্যে ছিলেন? (১) সুলাইমান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সুহাইম (মৃঃ ১১৮১হিঃ), (২) মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ ফিরুজ নজদী (মৃঃ ১২১৬ হিঃ), (৩) মুহাম্মাদ ইবনু আবদির রহমান ইবনু আফালিক্ব (মৃ ১১৬৩ হিঃ), (৪) আব্দুলাহ ইবনু ঈসা আল মুওয়াইসী (মৃ ১১৭৫ হিঃ), (৫) উছমান

---

৮০. শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওহ্হাবঃ দা'ওয়াতুহু ওয়া সীরাতুহু, পৃঃ ২৭ - ২৮।

ইবনু আবদিল আযীয মনসুর, (৬) মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু হুমাইদ (মৃ ১২৯৫ হিঃ), (৭) মারবাদ ইবনু আহমাদ তামীমী (মৃঃ প্রায় ১১৭১ হিঃ)।

আরো কতিপয় আলিম এমন আছেন যাঁরা নিজেরা শায়খ মুহাম্মাদের তাওহীদবাদী আন্দোলনের সরাসরি বিরোধিতা করেননি। তবে তাঁরা যেখানে অবস্থান করতেন সেখানকার আন্দোলনবিরোধী লোকদের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি স্পষ্টতই পরিলক্ষিত হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু সালুম আল ফারাজী, ইবরাহীম ইবনু ইউসুফ, রাশিদ ইবনু খুনাইন, ইবনু ইসমাঈল, ইবনু রাবী'আ, ইবনু মাতলাক্ব, ইবনু আবদিল লতীফ ও সালেহ ইবনু আবদিল্লাহ প্রমুখ।

তবে এ কথা সত্য যে, যাঁরা শায়খ মুহাম্মাদের বিরোধী ছিলেন তাঁদের অনেকের কাছে প্রকৃত সত্য ও হাক্বীকৃত প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁরা স্বীয় পূর্ব মত ত্যাগ করে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। কেননা সত্যই অনুসরণের সর্বাধিক হকদার।

সাম্রাজ্যবাদীদের বিরোধিতাঃ

ইসলামের শত্রুগণ তাদের চিরাচরিত নীতি অনুযায়ী ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি সংঘর্ষে অবতীর্ণ হতে চায় না। কেননা তারা যুক্তি প্রমাণের দিক দিয়ে দুর্বল এবং ইসলামের মুকাবিলায় বেশিক্ষণ টিকে থাকার মতো নয়। খৃস্টান ও ইসলাম বিদ্বেষীরা স্পেন, সিরিয়া, ইউরোপ ও উছমানী সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ ও অন্যান্য ঘটনাবলীর আলোকে ভাল করেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, খাঁটি ও নির্ভেজাল ইসলাম তাদের প্রধান শত্রু। তাই তারা ইসলামের বিকৃতি, এর অনুসারীদের মধ্যে বিভেদ, ফিৎনা ও অশান্তি সৃষ্টি করা একান্ত জরুরী মনে করে। সাম্রাজ্যবাদীদের শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের তাওহীদী দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধে এ ধরণের কিছু ভূমিকার নযীর তুলে ধরা হলো।

ইংরেজগণঃ

ইংরেজগণ তাদের গর্বের উপনিবেশ প্রাচুর্যে ভরা ভারতবর্ষে শায়খ মুহাম্মাদের নির্ভেজাল তাওহীদী আন্দোলনের প্রভাব ও প্রসার উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করে। পূর্বেই উলেখ করা হয়েছে যে, শায়খ মুহাম্মাদের দাওয়াত ও সংস্কার কর্মের প্রভাব বিভিন্ন মহাদেশের দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের উপর ব্যাপক ভাবে পড়েছিল। ভারত বর্ষে শায়খ আহমাদ ইবনু ইরফান, তাঁর অনুসারীগণ, নিছার আলী ওরফে তিতুমীরের মুহাম্মাদী আন্দোলন, হাজী শরীয়া'তুলাহর ফারায়েজী আন্দোলন, সাইয়্যেদ আহমাদ বেরেলভীর খিলাফত আন্দোলন এবং অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের উপর শায়খের আন্দোলনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে এ সব আন্দোলন ইংরেজদের মানস সন্তান কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। তাই ইংরেজগণ বিচলিত হয় এবং শায়খ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য দারুণ আগ্রহী হয়ে উঠে। এ পথে তারা প্রচুর শ্রম ও অগাধ ধন সম্পদও ব্যয় করে। বৃটিশ অফিসার

এবং ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি 'জর্জ ফরেস্টার স্যাডলিয়ার' (George Forester Sadleer) ১৮১৯ ঈ. সালে রিয়াদ সফর করেন। ইংরেজদের যোগসাজসে সউদী রাষ্ট্রের পতনের উদ্দেশ্যে ইবরাহীম পাশা (১২৩৩হিঃ/ ১৮১৮ঈ.) 'দারঈয়্যাহ' আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে সউদী ও মুজাহিদ বাহিনীর পরাজয় হলে 'দারঈয়্যাহ' শহরের পতন হয়। এ জন্য জর্জ স্যাডলিয়ার আনন্দ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি মদীনায় গিয়ে ইবরাহীম পাশাকে বৃটেনের পক্ষ থেকে এই বিজয়ের জন্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তাঁকে প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করেন। এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে ওয়াহহাবী আন্দোলনের মুলোৎপাটন হলো বলেও নিজে সান্তনা লাভ করেন এবং বৃটিশ সরকারকেও আস্বস্ত করেন।[৮১] শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের হাতে গড়া প্রকৃত তাওহীদবাদী ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্র 'দারঈয়্যার' পতনের মধ্য দিয়ে প্রথম সউদী রাষ্ট্রের অবসান হয়। ঐতিহাসিক সেন্ট জন ফিলবী (ST. J. Philby) এই পতনকে 'প্রথম ওয়াহহাবী সাম্রাজ্যের' পতন বলে আখ্যায়িত করেন।[৮২]

ইতালিয়গণঃ

আলজিরিয়ার মুহাম্মাদ ইবনু আল সানুসীর সংস্কারধর্মী আন্দোলন ইতালীয়গণকে বিচলিত করে তোলে। একইভাবে সোমালিয়া ও মরক্কোর মুসলিমদের উপর শায়খ মুহাম্মাদের আন্দোলনের বিরাট প্রভাব পড়ার ফলে এ সব দেশে বিদেশী দখলদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। এ জন্যে ইতালিয়গণ এ আন্দোলন নিয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে এবং তা প্রতিরোধ করার জন্যে সকল প্রকার চেষ্টা অব্যাহত রাখে।

হল্যান্ডীয়গণঃ

হল্যান্ডীয়গণ যে সব মুসলিম দেশে উপনিবেশ গড়ে তোলে সেখানকার মুসলিমদের সত্য দ্বীনের প্রতি নতুন করে আগ্রহ ও উৎসাহ তাদেরকে চরমভাবে নাড়া দেয়। ইন্দোনেশিয়ার হাজীদের মাধ্যমে তাওহীদের সঠিক দাওয়াত সেদেশের বিভিন্ন দ্বীপ ও অঞ্চলে বিশেষ করে সুমাত্রা ও জাওয়াতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে হল্যান্ডবাসীদের বিরোধিতার ধরণও তীব্রতর হয়ে উঠে।

উছমানী সাম্রাজ্য ও শায়খ মুহাম্মাদের আন্দোলনঃ

ইউরোপ, তুরস্ক এবং আফ্রিকার কতিপয় দল শায়খ মুহাম্মাদের দাওয়াতে প্রভাবিত হওয়ার পাশাপাশি সিরিয়া, মরক্কো প্রভৃতি দেশের মুসলিম চিন্তাবিদগণ কর্তৃক এর প্রতি গুরুত্ব প্রদানের ফলে উছমানী সাম্রাজ্যের উর্ধ্বতন সরকারী কর্তৃপক্ষ ও স্বার্থান্বেষী মহল

---

৮১. ড. মুহাম্মাদ আল গুয়াই'ইরঃ ওয়াহহাবী আন্দোলন সম্পর্কিত এক ঐতিহাসিক ভ্রান্তির নিরসন, পৃঃ ১১১।

৮২. মাসউদ নদভীঃ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহাব, মুসলিহুন মযলুম, ১৯৮৪, পৃঃ ১১৬ ।

বিচলিত ও শঙ্কিত হয়ে উঠেন। তাঁরাই উছমানীদের কাছে খাঁটি তাওহীদের দাওয়াতের বিরুদ্ধে প্রকৃত তথ্য বিকৃত করে উপস্থাপন করেন। উপরন্তু হাজ্জ মৌসুমে কোন কোন বেদুঈন লোকদের আচরণকে কেন্দ্র করে স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে সেগুলোকে সম্বল হিসাবে ব্যবহার করেন। এ ভাবে তাঁরা উক্ত আন্দোলনের প্রতি লোকদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করেন। যাতে করে লোকদের মনে এই দাওয়াতের ধারক বাহকদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণার জন্ম হয়। তাদের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এর মাধ্যমে তাদের স্বার্থ সিদ্ধি নিশ্চিত হয়।

বর্তমান সময়েও আমরা দেখতে পাই যে, যখন ইসলামী জাগরণের ফলে মুসলিম যুবকেরা ইসলামের প্রতি গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ তায়া'লার বিধি নিষেধ ও শিক্ষার দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তখনই প্রাচ্য- পাশ্চাত্য, তাদের পত্র - পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যমগুলোসহ তাদের চিন্তাবিদরা বাস্তব চিত্রকে বিকৃত ও সেই গতিধারার প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টির অপচেষ্টা শুরু করে এবং ইসলামের পক্ষে পট পরিবর্তনকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করতে থাকে। যাতে এর মাধ্যমে উক্ত গতিধারায় বাধার সৃষ্টি হয় এবং এর উৎসাহ উদ্দীপনা নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ইসলামের শত্রুগণ বিশেষ করে উপনিবেশিক শক্তি মুসলিম দেশগুলোর সম্পদ লুণ্ঠনের জন্যে নিজেরা মুসলিম বিশ্বকে ভাগাভাগি করে নেয়। এ কাজের সুবিধার জন্যে মুসলিম জামা'য়াতের ভেতরে অনৈক্যের বীজ বপন করে "মুসলিমদেরকে বিভক্ত কর এবং শাসন কর" নীতিতে এ ধরনের খাঁটি ও নির্ভেজাল ইসলামী দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনকে সর্ব শক্তি দিয়ে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী ও হল্যান্ডীয় উপনিবেশ গোষ্ঠী নিজেদের কলোনীগুলোতে এই কৌশলকে কাজে লাগায়। পাশাপাশি খৃস্টান মিশনারীগণ এবং নাস্তিক্য ও অন্যান্য ভ্রান্ত মতবাদের প্রচারকদেরকে সক্রিয় সহযোগিতা দিয়েও সক্রিয় করে তোলে। যাতে মুসলিমগণ তাদের স্বীয় বিশুদ্ধ দীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করে। কিন্তু এতদসত্বেও তাওহীদের এই খাঁটি দাওয়াতী আন্দোলনের প্রতি সমর্থনের ব্যাপক সাড়া পড়ে সুদান, মিশর, সিরিয়া, ইয়ামান, ভারত, আফগানিস্তান, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপ পুঞ্জ, নাইজিরিয়া, আফ্রিকার অনেক দেশ সহ আরো বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলগুলোতে। এই দেশগুলোর উল্লেখ ঐ সব লোকদের লেখায় পাওয়া যায়, যারা শায়খ মুহাম্মাদের জীবন চরিত ও মুসলিম বিশ্বে এর প্রভাব সম্পর্কে গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেছেন। কেননা এই আন্দোলন মুসলিমদের মধ্যে মনোবল সৃষ্টি করে এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থা থেকে তাদেরকে সক্রিয় করে তোলে। চিন্তার ক্ষেত্রে জাগরণ ও বিপ্লব সৃষ্টি করে। ব্যাপকভাবে নির্ভেজাল ও সঠিক দীনী জ্ঞানের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের সংস্কার সাধনে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি করে। ইমাম মালিক রহঃ বলেছিলেনঃ "শেষ যুগের উম্মাতকে কেবল সেই ধর্ম বিশ্বাস ও নীতি আদর্শই সংশোধন করতে পারে যা প্রথম যুগের উম্মাতকে সংশোধন করেছিল"। আর এটা তো স্বত: সিদ্ধ কথা যে, প্রথম যুগের উম্মাতকে ইসলামের সঠিক আকীদাহ বিশ্বাসই সংশোধন করেছিল এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্বের মর্যাদায় বসিয়েছিল।

মূলতঃ এই কারণেই শায়খ মুহাম্মাদের নির্ভেজাল খাঁটি সংস্কার আন্দোলন উপনিবেশবাদীদের গায়ে কম্পন সৃষ্টি করে এবং এই আন্দোলন, এর নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে তাদের করণীয় সম্পর্কে অনুভূতিকে সক্রিয় করে তোলে।

শায়খ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের প্রতি আরোপিত কতিপয় অপবাদঃ

ইসলাম ও মুসলিমদের দুশমনগণের পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব এর নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত এবং মুসলিম সমাজে কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী গড়ে উঠা বিভিন্ন ধরণের কুসংস্কার দূরীভূত করার লক্ষ্যে পরিচালিত সংস্কার কর্মকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য ইসলাম ও দাওয়াতের শত্রুগণ শায়খ মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিচালিত দাওয়াতকে কেন্দ্র করে অনেক মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক অপবাদ দিয়ে থাকে। বক্ষ্যমান আলোচনায় আমরা সেগুলো থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু অপবাদের কথা তুলে ধরার প্রয়াস পাব। এবং সেগুলো বিচার বিশ্লেষণ করে এ অপবাদগুলোর প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করা সহ এগুলো নিরসন করার চেষ্টা করব, ইনশা আল্লাহ।

(১) 'ওয়াহহাবী মতবাদ' একটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত পরিভাষাঃ

শায়খের খাঁটি তাওহীদ ও কুরআন সুন্নাহর দাওয়াত সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানোর হীন উদ্দেশ্য নিয়েই এই আন্দোলনকে 'ওয়াহহাবী আন্দোলন' বা 'ওয়াহহাবী মতবাদ' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। হিংসুক ও দুশমনেরা এই পরিভাষাটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুদূর প্রসারি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আরোপ করে থাকে। এর পেছনে তাদের অসৎ দৃষ্টি ভঙ্গি যে আছে তার প্রমাণ মেলে এভাবে যে, সাধারণতঃ কোন সংস্কার কর্মের স্থপতির নামের প্রথমাংশ কিংবা বংশের দিকে সম্বোধিত করে রাখা হয়। যেমনঃ হানাফী মাযহাব, মালেকী মাযহাব, শাফেঈ মাযহাব ইত্যাদি। সে অনুযায়ী মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব এর সংস্কার আন্দোলনের নাম হওয়া উচিৎ "মুহাম্মাদী আন্দোলন" বা "মুহাম্মাদী মাযহাব"। কিন্তু তা না করে কেন মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের সংস্কার আন্দোলনকে তাঁর পিতার নামে সম্বোধিত করে 'ওয়াহহাবী আন্দোলন' করা হলো? অথচ তাঁর পিতা আব্দুল ওয়াহাব এই আন্দোলন শুরু করেননি।

কে বা কারা সর্ব প্রথম শায়খের এই তাওহীদবাদী আন্দোলনকে ওয়াহহাবী আন্দোলন হিসাবে আখ্যায়িত করেছে তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও সার্বিক বিচারে এটা অনেকটা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, এ ধরণের রহস্যময় নামকরণের পেছনে এই আন্দোলনের শত্রুদের একটি দুরভিসন্ধি ও অসৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। তার একটি এটা হতে পারে যে, এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে যদি আন্দোলনের নাম "মুহাম্মাদী আন্দোলন" হয়ে যায়, তাহলে হিতে বিপরীত হওয়ার আশংকা ছিল। সাধারণ মুসলিমগণ এই আন্দোলন নিয়ে কোন প্রকার সংশয় সন্দেহের মধ্যে আপতিত হতো না। কারণ পুরা দীন ইসলামকেই 'মুহাম্মাদী রিসালাত' বলা হয়ে থাকে রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সম্বন্ধিত করে। তাই রাসূল

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামের সাথে সংযুক্ত হলে আন্দোলনটি আরো অধিক গ্রহণযোগ্যতা পেতো। মুসলিমদের আবেগ এখানে বেশি কাজ করতো। তাতে সত্য দাওয়াতের দুশমনদের মন:পীড়ার কারণ হতো। ঐতিহাসিকভাবে এ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শায়খ মুহাম্মাদের সংস্কার কর্মের নাম "ওয়াহহাবী আন্দোলন" হিসাবে প্রথম দিকে প্রচলিত ছিলনা। বরং অনেকেই এই দাওয়াতী আন্দোলনকে "নতুন ধর্ম" বলে আখ্যায়িত করতো। তবে কোন কোন ইউরোপিয়ান লেখক এই আন্দেলনকে "মুহাম্মাদী আন্দোলন" হিসাবেও আখ্যায়িত করেছেন। এর প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে, ইউরোপের নীপুর নামক একজন পর্যটক যিনি আরব দেশ ভ্রমণ করেন এবং শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের সমসাময়িক ছিলেন তাঁর গ্রন্থে 'ওয়াহহাবী' নাম একবারও ব্যবহার করেননি। এ প্রসঙ্গে শায়খ মাসউদ নদভী বলেনঃ "এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, "ওয়াহহাবিয়া" এই পরিভাষা সেই সময় পর্যন্ত লোকদের মধ্যে পরিচিত ছিল না। তবে অনেকেই শায়খ মুহাম্মাদের দাওয়াতী আন্দোলনকে "নব ধর্ম" নামে আখ্যায়িত করতেন। যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁর এই মতবাদকে "মুহাম্মাদী মাযহাব" নামে পরিচয় দেওয়া হতো।[৮৩]

বস্তুতঃ "ওয়াহহাবী" পরিভাষাটি সর্বপ্রথম পার্কহার্ট, যিনি ১২২৯ হিঃ/১৮১৪ ঈসাঃ সনে মুহাম্মাদ আলীর হিজাযের কর্তৃত্ব গ্রহণের পর হিজায আগমন করে ছিলেন, তাঁর ১৮১৬ ঈসঃ সনে রচিত "ওয়াহাবীদের খবরাখবর" পুস্তিকায় উল্লেখ করেন। ১২৩৮ হিঃ সনে লিখিত ঐতিহাসিক আব্দুর রহমান আল জাবারাতীর গ্রন্থেও এই পরিভাষাটির ব্যাপক উল্লেখ পাওয়া যায়।[৮৪]

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হিজাযের উপর মিশরীয় অভিযানের দিনগুলোতে রাজনৈতিক কারণেই এই পরিভাষাটির ব্যাপক প্রচলন করা হয়। তারা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে অতি দূর দৃষ্টির সাথে এটিকে "ওয়াহহাবী মতবাদ" হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। স্বার্থান্বেষী মহল এই অপবাদমূলক নামের মাধ্যমে সর্বদা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, এটি ইসলাম ধর্ম বহির্ভূত একটি আন্দোলন। এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে ইংরেজ, তুর্কী ও মিশরীয়গণ। তারা এই আন্দোলনকে এক "ভীতিপ্রদ কায়া" হিসাবে এমন বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে ছিল যে, বিগত দুই শতাব্দি ধরে মুসলিম বিশ্বের যেখানেই কোন ইসলামী আন্দোলনের কাজ শুরু হয়েছে, এবং ইউরোপীয় গোষ্ঠী এটা তাদের স্বার্থের পরিপন্থী হিসাবে দেখেছে, তখনই তারা এর উপর "নজদী ওয়াহহাবী আন্দোলন" এর লেবেল এঁটে দিয়েছে।[৮৫] এই পরিভাষাটি স্বার্থান্বেষী আন্তর্জাতিক মহল রাজনৈতিক হীন স্বার্থে ব্যবহার করেছে। আবার তাদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যবহৃত ঘরের শত্রুগণও এটাকে ধর্মীয় স্বার্থে ব্যবহার করে মূল দুশমনদেরকে সাহায্য

---

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৭।
৮৪. প্রাগুক্ত , পৃঃ ১৬৮।
৮৫. ড. মুহাম্মাদ আল শুয়াই'ইর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪ - ১৫।

করেছে। "মুসলিমদেরকে বিভক্ত কর এবং শাসন কর" এই শ্লোগান ও কর্মসূচী বাস্ত বায়নের হাতিয়ার হিসাবে এই পরিভাষাটি বিরাট কাজ দিয়েছে। এ কথা সর্বজন বিদিত যে, সব সময়ই মুসলিম বিশ্বের শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারপন্থীরাই সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের ক্রীড়নক হিসাবে ক্রীতদাসদের মতো প্রভুদের খেদমত সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিয়ে থাকে।

ওয়াহহাবী বা ওহ্বী কারা?

ইমাম মালিক রহঃ এর মাযহাবের উপর লিখিত "আল মি'য়ারুল মু'রিব ওয়াল জামিউল মুগরিব আন ফাতাওয়া উলামায়ি আফরীকিয়া ওয়াল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব" নামক একটি গ্রন্থ।[৮৬] উক্ত গ্রন্থের একাদশ খণ্ডের ১৬৮ পৃষ্ঠায় প্রশ্নাকারে বলা হয়েছেঃ "ওয়াহহাবী মতাবলম্বীদের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে"?

এ প্রশ্নের উত্তরে শায়খ আলী ইবনু মুহাম্মাদ আল লাখমী (মৃত্যু ৪৭৮ হিঃ) যা বলেছিলেন তার সার কথা হলোঃ ওয়াহহাবীগণ খারিজী সম্প্রদায় এবং পথভ্রষ্ট কাফিরের দল। আল্লাহ পাক তাদেরকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিন। তাদের নির্মিত মসজিদ ধ্বংস করে দেয়া অপরিহার্য। এবং মুসলিম বিশ্ব জগত থেকে এদেরকে বিতাড়িত করা জরুরী।[৮৭]

প্রশ্নটি অত্যন্ত দৃষ্টি আকর্ষণকারী এবং সন্দেহ ও সংশয়পূর্ণ। উত্তরও ভয়ানক ও মারাত্মক স্পর্শকাতর। কেননা শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব আল নজদী (১১১৫ - ১২০৬ হিঃ) এর আকীদাহগত সংস্কার আন্দোলনকে বর্তমানে "ওয়াহহাবী আন্দোলন" এবং তাঁর অনুসারীদেরকে "ওয়াহহাবী" হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। তাই স্বভাবতঃই এই আন্দোলন সম্পর্কে উক্ত ফাতওয়া ব্যাপক বিভ্রান্তি ও সংশয় সৃষ্টি করে। বাস্তবেও মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের তাওহীদের দাওয়াত, কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক সংস্কার আন্দোলন এরূপ বিভ্রান্তি ও চরম মিথ্যা অপবাদের করুণ শিকারে পরিণত হয়। তাই গবেষণার মাধ্যমে প্রকৃত বিষয় মুসলিমদের সামনে পরিষ্কার করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাছাড়া সালফে সালিহীনের অনুসারী একটি অনন্য দাওয়াতী ও সংস্কার আন্দোলনকে এরূপ সর্বনাশী অপবাদ থেকে মুক্ত করা ঈমানী দায়িত্বও বটে।

এ বিষয়ে প্রকৃত ইতিহাস হলোঃ 'আল মি'য়ার' গ্রন্থের লেখক আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল ওয়ানসুরাইসী মালেকী মাযহাবের বিশিষ্ট ফক্বীহ থেকে উক্ত ফাতওয়া নকল করেছেন। তাঁর মৃত্যু হয় ৯১৪ হিঃ সনে। অপরদিকে মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব আল নাজদীর জন্ম হলো ১১১৫ হিঃ সনে আর মৃত্যু হয় ১২০৬ হিঃ সনে। তাহলে

---

৮৬. বইটি লিখেছেন আহমাদ ইবনু ইয়াহইয়া আল ওয়ানসুরাইসী (মৃঃ৯১৪হিঃ), বৈরুত, প্রকাশকঃ আল গারব আল ইসলামী প্রেস, ১৪০১ হিঃ/ ১৯৮১ঈ.। গ্রন্থটি মোট ১৩ খণ্ডে সংকলিত। মরোক্কো সরকার এই বিরাট গ্রন্থটি নিজ খরচে ছেপে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেছেন। দ্রষ্টব্যঃ ড. মুহাম্মাদ আল শুয়াই'ইর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪, ৮৩।

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪ – ১৫।

তাঁদের মধ্যে মৃত্যুর তারিখ অনুযায়ী সময়ের ব্যবধান হলো ২৯২ বছর। অন্যদিকে আলী ইবনু মুহাম্মাদ আল লাখমী (উক্ত ফাতওয়া প্রদানকারী) মৃত্যু বরণ করেছেন ৪৭৮ হিঃ সনে। সে অনুযায়ী শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহ্হাব এবং তাঁর মধ্যে মৃত্যুর তারিখ অনুযায়ী সময়ের ব্যবধান হলো ৭২৮ বছর। এ সকল মনীষীদের জন্ম ও মৃত্যুর এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, 'আল মি'য়ার' গ্রন্থে প্রদত্ত ফাতওয়া কোন অবস্থাতেই শায়খ মুহাম্মাদ আল নাজদী কর্তৃক পরিচালিত দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের, যাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে 'ওয়াহ্হাবী আন্দোলন' হিসাবে পরিচিত করানো হয়েছে, প্রযোজ্য নয়। এবং তা কখনও সম্ভবও নয়। কারণ ফাতওয়াটি শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহ্হাবের জন্মেরও সাত শত বছরের অধিক সময় পূর্বে প্রদত্ত।

তাহলে 'ওয়াহ্হাবী মতবাদ' কি? এবং কাদেরকে 'ওয়াহ্হাবী' বলা হয় যাদেরকে কেন্দ্র করে ৫ম হিজরী শতাব্দিতেও উপরোক্ত ধরনের ফাতওয়া মালেকী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ প্রদান করেছেন?

বস্তুতঃ 'ওয়াহ্হাবিয়া' বা ওহ্বিয়া মতবাদ' খারিজী আবাযী ফিরক্বা। এ ফিরক্বার জন্মদাতা আব্দুল ওয়াহ্হাব ইবনু আবদির রহমান ইবনু রুস্তম খারিজী আবাযী (মৃত্যুঃ ১৯৭ হিঃ)। তাঁরই নামানুসারে এই ফিরক্বার নাম 'ওয়াহ্হাবিয়া' নামকরণ করা হয়। তারা ছিল ইসলামী শরীয়াতের ঘোর বিরোধী। তাদের রাজত্বে শরীয়াহকে নিষিদ্ধ করা হয়। হাজ্জ বাতিল করা হয়। ইসলাম ধর্মে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়। তারা সুন্নী জামায়'াতকে চরম ঘৃণার চোখে দেখতো। এক কথায় তাদের আক্বীদাহ বিশ্বাস আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আক্বীদাহ বিশ্বাসের বিরোধী ছিল। এ সব কারণে তাদের সঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদের অনেক যুদ্ধও সংঘটিত হয়।[৮৮]

প্রকৃত অর্থে 'ওয়াহ্হাবীরা' খারিজী আবাযী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। যাদের বিরুদ্ধে আলী ইবনু আবি তালিব (রা) নাহরাওয়ান (৩৮ হিঃ) নামক স্থানে যুদ্ধ করেছিলেন। এদেরই একটি উপদলের নাম 'ওয়াহ্হাবিয়া'। এদের বিভক্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিক ভাবে যতদূর জানা যায় তাহলো, মরক্কোর আবাযীয়াদের একটি অংশ ছিল উত্তর আফ্রিকার থার্ত নগরে। উত্তর আফ্রিকায় যাদের রুস্তমী রাজত্ব ছিল। পারস্য বংশোদ্ভূত আব্দুর রহমান ইবনু রুস্তম ১৭১ হিঃ সনে মৃত্যু অত্যাসন্ন হওয়ার সময় সাতজন সর্বোত্তম সরকারী কর্মচারীর প্রতি ওছিয়তের মাধ্যমে দায়িত্ব অর্পণ করে। তাদের মধ্যে তার আপন ছেলে আব্দুল ওয়াহ্হাব ও ইয়াযিদ ইবনু ফান্দিকও ছিলো। পরবর্তী সময়ে লোকেরা আব্দুল ওয়াহ্হাবের হাতেই বাই'আত গ্রহণ করে। ফলে আব্দুল ওয়াহ্হাব ও ইয়াযিদ ইবনু ফান্দিকের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়। পরবর্তীকালে এই আবাযিয়া

৮৮. আলফ্রেড বেল (ফরাসী), আল ফিরাকুল ইসলামিয়্যাহ ফী সিমালি আফরিক্বিয়া, তারজমাঃ আব্দুলাহ বাদবী, ১৪০ – ১৫২।

মতবাদ, যা ইবনু রুস্তম ও তার সহচরদের ধর্ম ছিল তা প্রধানতঃ দুটি ফিরক্বায় বিভক্ত হয়। একটি হলোঃ ওয়াহাবিয়া, যা আব্দুল ওয়াহাব ইবনু আবদির রহমান ইবনু রুস্তম এর নামের সাথে সম্বোধিত হয়। অপরটি হলোঃ নাকারিয়াহ, যা ইবনু ফান্দিক্বের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।[৮৯] মরক্কোর আবাযীয়া খারিজীগণ সবচেয়ে কঠোর চরমপন্থী দল ছিল। তারা আব্দুল ওয়াহহাব ইবনু আবদির রহমান ইবনু রুস্তম এর অনুসারী ছিল। তার নামানুসারে এই ফিরক্বাকে 'ওয়াহহাবীয়া' নামে আখ্যায়িত করা হয়।[৯০]

প্রকৃতপক্ষে তৎকালে উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে এই 'ওয়াহহাবী আন্দোলন' একটি ভ্রান্ত ও বাতিল ফিরক্বা হিসাবে ব্যাপক আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল। অন্য কোন মুসলিম দেশে এই ফিরকার অস্তিত্ব ছিল না। প্রমাণ স্বরূপ আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল কারীম আল শাহরাস্তানী (৪৭৯– ৫৪৮হিঃ) লিখিত "আল মিলাল ওয়ান নিহাল" এবং আবু মুহাম্মাদ ইবনু হাযম (৩৮৪– ৪৫৬হিঃ/ ৯৯৪– ১০৬৩ ঈ.) লিখিত "আল ফাসল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল" নামক গ্রন্থদ্বয়ে 'ওয়াহহাবী মতবাদ' নামে কোন দল বা ফিরকার উল্লেখ নেই। তাই সম্ভবতঃ উত্তর আফ্রিকা এবং স্পেনের আলিম উলামা এবং ফক্বীহগণের এতদ সংক্রান্ত বক্তব্য ও ফাতওয়া রয়েছে, যা মালেকী মাযহাবের বিভিন্ন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এবং এই অঞ্চলের ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতেও এই ফিরক্বা সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। তবে এই আন্দোলন উক্ত এলাকার বাইরে মুসলিম বিশ্বের আর কোন অঞ্চলে প্রবেশ করেনি। এই কারণে এ সম্পর্কিত ঐতিহাসিকগণ এবং এতদ অঞ্চলের আলিম উলামার লেখনীতে তা স্থান পায়নি। যেমনঃ শাহরাস্তানী, ইবনু হাযম এবং ইবনু তাইমিয়া প্রমুখ।

প্রত্যেক নিষ্ঠাবান মুসলিম মাত্রই জ্ঞাত আছেন যে, ইসলামের দুশমনেরা মুসলিম জাতিকে দ্বিধা বিভক্ত করার নিমিত্তে হেন কৌশল ও সুযোগ নেই যা তারা ব্যবহার করে না। সাম্রাজ্যবাদী ও স্বার্থান্বেষী মহল এ পরিভাষাটি মূলতঃ মুসলিম সমাজে পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ এবং শত্রুতার আগুন প্রজ্বলিত করার কাজে মরক্কোর আলিমগণের 'ওয়াহহাবী মতবাদ' বিরোধী ফাতওয়াকে ব্যবহার করে। সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলে তাদের প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। তাদের দাপট ও আধিপত্য চরম শিখরে পৌছে গিয়েছিল। ক্রুসেডের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারা ভাল করেই জেনে নিয়েছিল যে, তাদের স্বার্থ সিদ্ধির পথে প্রধান অন্তরায় হলোঃ নির্ভেজাল ইসলাম ও খাঁটি তাওহীদের প্রচার ও প্রসার। এমতাবস্থায়, তারা উপরোক্ত 'রুস্তমী ওয়াহহাবিয়া' মূলতঃ খারিজী মতবাদের মধ্যে একটি রেডিমেইড লেবাস শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খাঁটি তাওহীদের দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের গায়ে পরিয়ে দেয়। এই কাজে তারা বিদ'আতপন্থী ও প্রবৃত্তির অনুসারীদেরকে নিজেদের দলে ভিড়াতে সক্ষম হয়। এই পরিভাষাগত অপবাদ ও

৮৯. ড. মুহাম্মাদ আল শুয়াই'ইর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮, ২৯।

৯০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯।

এতদ সংক্রান্ত পূর্ববর্তী আলিমগণের ফাতওয়া ও অভিব্যক্তি সূফী সম্প্রদায় ও তাদের স্বার্থসংরক্ষনকারী মহলকে সক্রিয় করে তোলে। তারা মনে করে যে, এর মাধ্যমে মুসলিমদেরকে একদিকে যেমন বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত করা যাবে, অন্যদিকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত অনুযায়ী প্রবর্তিত ও প্রচলিত প্রকৃত দীন ও আকীদাহ্ থেকে তাদেরকে দূরে সরানো সম্ভব হবে। মুসলিম জাতির মধ্যে সংঘাত ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে তাদেরকে "বিভক্ত কর এবং শাসন কর" পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের এই কৌশলগত নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উক্ত পরিভাষাটি বিরাট সহায়ক হয়। বস্তুতঃ নির্ভেজাল তাওহীদ ও তাওহীদ ভিত্তিক এই সংস্কার অন্দোলনের বিরোধীপক্ষ বিশেষ করে এক শ্রেণীর সূফী সাধক ও তাদের সমর্থকগণ জেনেই হোক কিংবা না জেনেই হোক ইসলাম ও মুসলিম জাতির দুশমনদের অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে। তারা তাওহীদের এই দাওয়াতকে "ওয়াহহাবী দাওয়াত" নাম দিয়ে ঘৃণা ছড়ানো এবং সত্যের বিকৃতি ঘটানোর কাজ করে। তাই বলা যায় ভণ্ড সূফী মতবাদগুলোর অনুসরণকারীগণ ব্যক্তিগত কায়েমী স্বার্থের সংরক্ষণ এবং পার্থিব উপার্জনের পথকে নিষ্কন্টক করার জন্যই এই আন্দোলনের বিরোধিতা করে। কারণ স্বার্থ সংরক্ষণের পথে তাদের বড় অস্ত্র হলো সাধারণ মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করা এবং শাসকবৃন্দের সম্মুখে এই দাওয়াত সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করা এবং তাদের ক্ষমতার প্রতি এ দাওয়াত ও আন্দোলন একটি হুমকি তা জোরে শোরে তুলে ধরা।

এটাতো ছিল শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের নির্ভেজাল তওহীদের দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আরোপিত বিভ্রান্তি মূলক পরিভাষাগত অপবাদ। তাছাড়া দাওয়াতের কর্মসূচী, আক্বীদাহ বিশ্বাস, চিন্তা চেতনা ও মতামত নিয়েও তাঁর প্রতি অনেক মিথ্যা ও মনগড়া অভিযোগ ও অপবাদের কালিমা লেপন করা হয়। তন্মধ্যে উলেখযোগ্য হলোঃ

(২) দাওয়াত অগ্রাহ্যকারী কাফিরঃ শায়খ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের প্রতি এ অপবাদ দেয়া হয় যে, তিনি দাবী করেছেন যে, যারা তাঁর দাওয়াতকে গ্রহণ করবে না তারা কাফির। এ প্রসঙ্গে ইবনু আবিদীন শামী (মৃঃ ১২৫৮হিঃ/ ১৮৪২ঈ) তাঁর প্রসিদ্ধ 'রাদ্দুল মুখতার' গ্রন্থের টিকাতে উল্লেখ করেছেনঃ "যেমন বর্তমান যুগে মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের অনুসারীদের দেখতে পাওয়া যায়। যারা নজদের অধিবাসী, পবিত্র হারামাইন শরীফাইনের (মক্কা ও মদীনা) উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং হাম্বলী মাযহাবের দাবীদার, তাদের বিশ্বাস হলো তারাই কেবল মুসলিম। আর যারা তাদের আক্বীদাহর পরিপন্থী তারা হলো মুশরিক। তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াত এবং তাদের আলিমগণকে হত্যা করা বৈধ মনে করে"।[৯১]

---

৯১. রাদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩০৯। দ্রষ্টব্যঃ মাসউদ নদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৫।

আমরা ইতোপূর্বে শায়খ মুহাম্মাদের দাওয়াতের মৌলিক নীতি মালায় আলোচনা করেছি তিনি কাফির ঘোষণার ক্ষেত্রে কি নীতিমালা অনুসরণ করতেন। তিনি সাধারণভাবে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের অনুসারীদেরকে কাফির ফাতওয়া দেননি। তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ তাঁর জীবদ্দশাতেই করা হয়। তিনি শক্তভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেনঃ

" وإذا كنّا لا نكفّر من عَبَدَ الصَنَمَ الذي على قبّةِ عبدِ القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبّهم فكيف نكفّر مَنْ لم يُشرِكْ بالله أو لم يهاجر إلينا ولم يكفر ... سبحانك هذا بهتانٌ عظيمٌ ".

" আমরা যখন ঐ সব মুসলিমকে কাফির ঘোষণা করিনা যারা না জেনে, না বুঝে, এবং তাদেরকে সতর্ক করারও কেউ নেই, শায়খ আব্দুল কাদির, আহমাদ বাদাবী এবং তাদের মতো অন্যদের কবরের গম্বুজের উপর প্রতিষ্ঠিত মূর্তির (সনম) পূজা করে তাহলে যারা শিরক করে নি কিংবা কুফরীও করে নি অথচ আমাদের দাওয়াতের অনুসারী হয় নি তাদেরকে কিভাবে কাফির ঘোষণা করব ? ... আল্লাহ, তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করে বলছি এটা তো মস্তবড় অপবাদ "।[৯২]

(৩) নবুওয়াতের দাবীঃ তাঁর প্রতি নবুওয়াত দাবীর অপবাদ দেয়া হয়েছে। এ অপবাদদানকারীদের মধ্যে ছিলেন আল যাহাবী আল ইরাকী, আহমাদ যাইনী দাহলান এবং আহমদ হাদ্দাদ আল আলাবী। এক্ষেত্রে তাঁদের অপবাদের ভাষা ছিল যে, "তিনি নবুওয়াতের দাবী করতে চেয়েছিলেন তবে তা স্পষ্ট করে বলার সাহস পাননি"।[৯৩]

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো অপবাদদানকারীদের সকলের ভাষা প্রায় একই রকম যে, "তিনি নবুওয়াতের দাবী করতে চেয়েছিলেন স্পষ্ট করে বলেননি"। তাহলে তাঁরা তাঁর মনের কথা কিভাবে জানতে পারলেন? আল্লাহ পাক কি তাঁদের নিকট ওহী নাযিল করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, শায়খ মুহাম্মাদ নবুওয়াত দাবী করতে চেয়েছে? এটাইতো প্রমাণ করে যে তাঁদের এ অপবাদ সর্বৈব মিথ্যা।

তাছাড়া শায়খ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব বারবার তাঁর লেখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে নিজের দাওয়াত ও মতামতকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। তিনি ইরাকের আল সুয়াইদী উপাধির একজন আলিমের চিঠির উত্তরে তাঁকে লিখেছেনঃ

---

৯২. হুসাইন ইবনু গান্নাম, রাওযাতুল আফকার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭৯।

৯৩. মিছবাহুল আনাম, লেখকঃ আহমাদ আব্দুল্লাহ বাআলাভী, পৃঃ ৫, ৬। আল দুরার আল সিনিয়্যাহ, পৃঃ ৪৬।

" أخبرُكَ أنّي وله الحمد متّبعٌ ولستُ بمبتدع. عقيدتي وديني الذي أدينُ الله به مذهبُ أهلِ السنّةِ والجماعةِ، الذي عليه أئمةُ المسلمين، مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة. لكني بيّنت للناس إخلاص الدين لله، ونَهَيْتُهم عن دعوة الأحياء والأموات من الصالحين وغيرهم، وعن إشراكهم فيما يعبد الله به من الذبح والنذر والتوكل والسجود، وغير ذلك مما هو حق الله الذي لا يُشركه فيه ملكٌ مقرّبٌ ولا نبيٌّ مُرسلٌ، وهو الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهو الذي عليه أهل السنّة والجماعة".

"আল্লাহর প্রশংসা, আমি আপনাকে অবহিত করছি যে, আমি অনুসরণকারী, নতুন আবিষ্কারক নই। আমার আক্বীদাহ ও দীন আল্লাহ প্রদত্ত দীনের ধারক আহলি সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের উপর। যার উপর মুসলিম আলিমগণ, বিশেষ করে চারজন ইমাম এবং কিয়ামাত পর্যন্ত তাঁদের অনুসারীগণ আছেন। তবে আমি মানুষদেরকে দীন ও ইবাদাতকে শুধু আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করতে বলি। তাদেরকে নেক লোক অথবা অন্যদের নিকট জীবিত হোক কিংবা মৃত দু'আ বা প্রার্থনা করতে নিষেধ করি। জবাই, নযর, তাওয়াক্কুল, সাজদাহ সহ সকল প্রকার ইবাদাতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করতে নিষেধ করি। এ সব কাজে আল্লাহর সাথে না কোন ফেরেস্তা, না কোন নবী রাসূলকে শরীক করা যেতে পারে। এই ইবাদাতের দিকেই প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সকল রাসূলগণ দাওয়াত দিয়েছেন। এর উপরই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'য়াত প্রতিষ্ঠিত আছেন"।[৯৪]

(৪) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুপারিশকে অমান্য করাঃ শায়খ মুহাম্মাদ কি আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)_শাফা'য়াতকে অস্বীকার করেছেন? এমন বিষয় কি তাঁর কোন অনুসারীকে বলেছেন বলে প্রমাণ আছে? নিশ্চয় অভিযোগকারীদের নিকট এর কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া ইতোপূর্বে শাফা'য়াত সম্পর্কে তাঁর নীতিমালা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যার মাধ্যমে এ অভিযোগের অসারতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়।[৯৫]

(৫) পূর্ণাঙ্গ ও নিরংকুশ ইজতিহাদের দাবীঃ শায়খ মুহাম্মাদের সময়কালের ঘটনা প্রবাহের প্রতি নযর দিলে দেখা যায় যে, ইবনু আবদিল ওয়াহহাব 'নবুওয়াতের দাবী'

৯৪. হুসাইন ইবনু গান্নাম, তারীখে নাজদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৯।
৯৫. দ্রষ্টব্যঃ পৃঃ নং ১০।

করেছেন বা 'নতুন দীন' নিয়ে এসেছেন এমন অভিযোগ যখন মানুষ গ্রহণ করছে না, তখন বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর প্রতি 'পূর্ণাঙ্গ ও নিরংকুশ ইজতিহাদের' দাবীর অপবাদ চাপিয়ে দেয়। অথচ শায়খ মুহাম্মাদ এবং তাঁর অনুসারীদের কেউই পূর্ণাঙ্গ ইজতিহাদের দাবী করেননি। এ প্রসঙ্গে পূর্বেও আমরা শায়খের মাযহাব সম্পর্কে এবং তাঁর দাওয়াতের মৌলিক কর্মসূচী অংশে আলোচনা করেছি।[৯৬] এ প্রসঙ্গে শায়খ মুহাম্মাদ বলেনঃ

"ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق، ولا أحد يدّعيه إلا أنا في بعض المسائل إذا صحّ لنا نصٌّ جليٌّ من كتاب أو سنّة غير منسوخ ولا مخصّص ولا معارض بأقوى منه وقال به أحد الأئمة الأربعة أخذنا به وتركنا المذهب كإرث الجد والإخوة، فإنّا نقدّم الجدّ بالإرث وإن خالفه مذهب الحنابلة".

"আমি নিজেকে নিরংকুশ ও পরিপূর্ণ ইজতিহাদের উপযুক্ত বলে দাবী করি না। কেউ হয়তো এ রকম দাবী করেও না। তবে আমার সম্মুখে যদি কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট সহীহ দলীল থাকে, যা মানসুখ নয় ও খাস নয় এবং এর চেয়ে শক্তিশালী অপর দলীলের বিপরীত নয়, আর এ বিষয়ে চার ইমামের কেউ উক্তি করেছেন, তাহলে আমি দলীল অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং নিজ মাযহাবের বক্তব্যকে গ্রহণ করি না"। যেমনঃ দাদা ও ভাইদের ওয়ারিশ হওয়ার ক্ষেত্রে আমরা হাম্বলী মাযহাবের বিপরীতে ভাইদের আগে দাদার ওয়ারিশ হওয়াকে অগ্রাধিকার দেই"।

এ প্রসঙ্গে মাহমুদ শুকরী আল আলুসী বলেনঃ " ইজতিহাদের দাবীর অপবাদ ওয়াহহাবীদের প্রতি চরম মিথ্যা অপবাদ। কারণ নজদের সকল বাসিন্দাই ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল এর মাযহাবের অনুসারী"।[৯৭]

(৬) ওয়াহহাবীগণ খারিজী সম্প্রদায়ঃ ওয়াহহাবীদের প্রতি খারিজী অপবাদের ঐতিহাসিক বিভ্রান্তি নিয়ে আমরা বিশদ আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করেছি। এটা ছিল শত্রুদের সূক্ষ্ম একটি ঐতিহাসিক বিভ্রান্তি। বিষয়টি নিতান্তই 'উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপানোর মতোই ব্যাপার। ৫ম হিজরী শতাব্দির আব্দুল ওয়াহহাব নামের এক ব্যক্তির প্রকৃত খারিজী মতামতের বিষয়টিকে কৌশলে দ্বাদশ হিজরী শতাব্দির মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের সংস্কার আন্দোলনের উপর চাপানো হয়েছে। এ বিষয়টির অসারতা প্রমাণিত হয়েছে পূর্বের আলোচনার মাধ্যমে। এখানে আমরা কতিপয় হাদীছকে সামনে রেখে বিরুদ্ধবাদিরা যে আরো কতিপয় অপবাদ

৯৬. দ্রষ্টব্যঃ পৃঃ ৫, ১২।
৯৭. মাহমুদ শুকরী আল আলুসী, গায়াতুল আমানী ফী আল রাদ্দ আ'লা আল নাবাহানী, রিয়াদ, নাজদ প্রেস, পৃঃ ৬০।

ওয়াহহাবী আন্দোলনের উপর চাপানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছে তা নিয়ে আলোচনা করব।

শায়খ মুহাম্মাদের দাওয়াতের বিরোধীদের যাহাবী নামক জনৈক ব্যক্তি ওয়াহহাবীদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন যে, এই খারিজী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে অনেক হাদীছ রয়েছে, যে হাদীছগুলোতে আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সতর্ককরণমূলক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। যেমন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেনঃ وأشار إلى المشرق " الفتنة من هنا " অর্থাৎ "এখান থেকে ফিৎনার উৎপত্তি হবে"। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথা বলে পূর্বাঞ্চলের দিকে ইঙ্গিত করেছেন "। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো ইরশাদ করেছেনঃ

" يخرج أناسٌ من قبل المشرق يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّمِيَّةِ لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فُوقه ".

"পূর্ব দিক থেকে কিছু মানুষ বের হবে, তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু কুরআন তাদের গলদেশের নিচে নামবেনা। তারা দীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে যেমন তীর তার লক্ষ্যবস্তুকে ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তীর পুনরায় ধনুকের রশির দিকে ফিরে না আসা পর্যন্ত তারা দীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করবেনা "। অন্য আরেকটি বর্ণনায় আছে, " سيماهم التحليق" "তাদের চিহ্ন হলো তারা মাথা মুন্ডানো হবে "। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো ইরশাদ করেছেনঃ

" اللهُمَّ بَارك لنا في شامنا، اللهمّ بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله! وفي نجدنا؟ قال: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان ".

"হে আল্লাহ! আমাদের দেশ সিরিয়াতে বরকত দাও, ইয়ামান দেশে বরকত দাও "। লোকেরা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের নজদের জন্য দু'আ করুন। উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ " এখানে ভূমিকম্প ও ফিৎনা হবে। এখান থেকেই শয়তানের শিং গজাবে "।[৯৮]
অন্য আরেকটি বর্ণনায় অতিরিক্ত বর্ণিত আছে যে,

" هم شرُّ الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء".

---

৯৮. হাদীছ তিনটি বুখারীর কিতাবুল ফিতান, পৃঃ ১২২২, ও কিতাবুত তাওহীদ, পৃঃ ১৩০৫ এ বর্ণিত হয়েছে। হারামাইন ফাউন্ডেশন কর্তৃক মুদ্রিত।

" তারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব। যারা তাদেরকে হত্যা করবে অথবা তাদের হাতে যে নিহত হবে উভয়ের জন্য সুসংবাদ। তারা আল্লাহর কিতাবের দিকে মানুষকে ডাকবে বটে অথচ তারা নিজেরা আল্লাহর কিতাবের অনুসারী হবেনা"।[৯৯]

একইভাবে মক্কার তৎকালীন মুফতী আহমাদ ইবনু যাইনী দাহলান তাঁর লেখা 'ফিতনাতুল ওয়াহহাবিয়াহ' (ওয়াহহাবী ফিৎনা) নামক গ্রন্থে উপরোক্ত হাদীছগুলো দিয়ে ওয়াহহাবীদেরকে খারিজী হওয়ার অপবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ ইমাম আল বুখারীর বর্ণনা সহ বিভিন্ন বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, তারাই এই খারিজী দল। কারণ হাদীছে বর্ণিত "তাদের চিহ্ন হলো তারা মাথা মুন্ডানো হবে "। এ কথাটি কেবল তাদের দলের জন্যই প্রযোজ্য। তারা তাদের অনুসারীদেরকে মাথা ন্যাড়া করার নির্দেশ দিয়ে থাকে।[১০০]

হাদীছগুলোর বক্তব্য সত্য এতে কোন সন্দেহ নাই। তবে এ বক্তব্যগুলো যে, শায়খ মুহাম্মাদের নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের জন্য প্রযোজ্য এটা জঘন্য অপবাদ ও মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই না। বিরুদ্ধবাদীদের কোন অভিযোগ ধোপে টেকেনা, তাই তারা এই সত্যের অপলাপ নিয়ে হাযির হওয়ার চেষ্টা করেছে। অথচ এ হাদীছগুলোতে বর্ণিত "নাজদ " বা "মাশরিক " (পূর্বাঞ্চল) বলতে কি বুঝানো হয়েছে তার আলোচনা হাদীছের বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ ও উম্মাতের নিকট গ্রহণযোগ্য ভাষ্যকারগণ[১০১] স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, এখানে 'নজদ' ও 'মাশরিক' বলতে 'ইরাক' বুঝানো হয়েছে। কারণ মদীনাহ মুনাওয়ারাহ থেকে ইরাক পূর্বদিকে। সুতরাং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পূর্বদিকে মুখ করে যখন সে দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন যে "এই দিক থেকেই ফিৎনার উৎপত্তি হবে "। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) এর হাদীছ ইমাম আল বুখারী বর্ণনা করেছেন[১০২]। উল্লেখিত ফিতনাগুলো হলোঃ উছমান (রা) এর হত্যাকান্ড, উষ্ট্রের যুদ্ধ, সিফফীন যুদ্ধ ইত্যাদি। এ সকল ঘটনার বীজ রোপন হয়েছে ইরাক থেকেই। আর হাদীছে বর্ণিত ব্যক্তিরা হলো খারিজীগণ। তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট হলো, তারা মাথা মুন্ডানো থাকে। মাথা ন্যাড়া করা আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবীদের (রা) নিয়মিত আমল ছিলনা। তারা হাজ্জ বা উমরাহ কিংবা কোন প্রয়োজন বশতঃই কেবল ন্যাড়া করতেন। তবে ন্যাড়া করা সর্বসম্মত ভাবে বৈধ ।[১০৩]
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বর্তমানে একদল মুসলিম মাথা ন্যাড়া করাকে নবীর (সাল্লাল্লাহু

---

৯৯. আল হাকিম, আল মুস্তাদরাক, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৯২, হাদীছ নং ২৬৯৭।
১০০. ইবনু দাহলান, ফিতনাতুল ওয়াহহাবিয়্যাহ, পৃঃ ৭৬।
১০১. যেমন বাদরুদ্দীন আইনী তার 'উমদাতুল কারী' ১৬ খন্ড, পৃঃ ৩৫৮, ৭৩৬ এবং ইবনু হাজার তার 'ফাতহুল বারীর' কিতাবুত তাওহীদে উলেখ করেছেন।
১০২. বুখারীর কিতাবুন ফিতান, পৃঃ ১২২২।
১০৩. বুহুছ নাদওয়াতে দাওয়াতিশ শায়খ, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃঃ ৬১ – ৬৪।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাত মনে করেন এবং নিজেরা সর্বদাই ন্যাড়া অবস্থায় থাকেন। উপরোক্ত হাদীছগুলোকে সামনে রেখে তাদের চিন্তাভাবনা করা উচিৎ।

(৭) রাসূল (সা) এর প্রতি দরুদ পড়তে নিষেধ করাঃ মক্কার মুফতী আহমাদ ইবনু যাইনী দাহলান তাঁর লেখা 'ফিতনাতুল ওয়াহহাবিয়াহ' (ওয়াহহাবী ফিৎনা) নামক পুস্তকে আরো অভিযোগ উত্থাপ করে বলেন যে, শায়খ মুাহাম্মাদ ও তাঁর অনুসারীগণ আযানের পরে মিম্বারের উপরে দাঁড়িয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর দরুদ পড়তে নিষেধ করেন। এমন কি একজন অন্ধ ব্যক্তি আযানের পরে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর সালাত ও সালাম পড়লে তাকে মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের নিকট ধরে নিয়ে আসা হয় এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী তাকে হত্যা করা হয়।[১০৪]

বস্তুতঃ এটা যে কতবড় মিথ্যাচার ও জঘন্য অপবাদ তা যে কোন বিবেকবান মানুষের নিকট স্পষ্ট। এতে বিস্মিত হওয়ারও তেমন কিছু নেই। কারণ সত্য ও দীনে হকের দাওয়াত যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের জীবনেই এ ধরনের মিথ্যা অপবাদের কালিমা লেপন করা হয়েছে। আসল বিষয় হলো শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ এবং সালফে সালিহীনের জীবনাদর্শকে নিজে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছেন এবং সে দিকেই মানুষদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন। তাই মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিদ'আতী কর্মকান্ড নিরসন করার জন্য তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রত্যয়ী। ঐ সময় কোন কোন স্থানে আযানের পরে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বিশেষ করে জুম'আর দিনে রাসূলের নামে দরুদ পাঠ করা হতো। শায়খ মুহাম্মাদ এই বিদ'আতী কাজকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং মানুষদেরকে এ থেকে সতর্ক করেন। যেহেতু বিদ'আত একটি ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট আমল যা ব্যক্তিকে গুমরাহির মধ্যে পতিত করে। বিদ'আত থেকে মুসলিমদেরকে ফিরিয়ে রাখা অপরিহার্য। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেনঃ

"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ"

"যে ব্যক্তি আমাদের দীনের মধ্যে ইবাদাতের নামে এমন কিছু উদ্ভাবন করলো যা দীনের অংশ নয় তা প্রত্যাখ্যাত"। অন্য আরেকটি বর্ণনায় আছে ঃ

"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ"

"যে ব্যক্তি এমন কাজ করলো যা আমাদের দীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত"। (সহীহ্ আল বুখারী, কিতাবুল সুলহ, সহীহমুসলিম, কিতাবুল আক্বদিয়াহ)

এ সব অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে শায়খ মুহাম্মাদের পুত্র শায়খ আব্দুল্লাহ বলেনঃ " এ সব অভিযোগের প্রেক্ষিতে আমাদের জবাব হলো (যেমন কুরআনের বাণী)ঃ

১০৪. ইবনু দাহলান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৬।

{ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ } অর্থাৎ "তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি ! এটাতো মস্তবড় অপবাদ"। (আন নূরঃ ১৬) বস্তুতঃ যারা আমাদের সম্পর্কে এ সব অভিযোগ করে অথবা এ সব কিছুকে আমাদের ঘাড়ে চাপায় তারা আমাদের উপর মিথ্যারোপ করে। আমাদের অবস্থা যারা দেখে, আমাদের বৈঠকগুলোতে যারা বসে এবং আমাদের ব্যাপার বিশ্লেষণ করে তাদের নিকট অকাট্যভাবে প্রমাণিত হবে যে এ সব অভিযোগ ও অপবাদ দীনের দুশমন এবং শয়তানের সহকর্মীদের দ্বারা আরোপিত মিথ্যা ও কাল্পনিক অপবাদ। এর মাধ্যমে তারা মানুষদেরকে আল্লাহর খাঁটি তাওহীদ ও ইবাদাতকে নিষ্ঠার সাথে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা এবং সকল প্রকার শিরক ত্যাগ করার বিশ্বাস থেকে ফিরিয়ে রাখতে চায়। আর শিরক তো এমন পাপ যা আল্লাহ তায়া'লা ক্ষমা করবেন না।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিরংকুশভাবে সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী। তিনি কবরের মধ্যে বারযাখী জীবন নিয়ে জীবিত আছেন। সেখানে তাঁর জীবন শহীদদের জীবনের চেয়েও উত্তম, যে বিষয়ে কুরআন কারীমে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। কারণ নিঃসন্দেহে তিনি তাদের চেয়েও উত্তম। তিনি তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম পাঠকারীর কথা শোনেন। তাঁর কবর যিয়ারত করা সুন্নাত। তবে শুধু তাঁর কবর যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে সফরে বের হওয়া যাবে না। বরং তাঁর মাসজিদ (মাসজিদে নববী) যিয়ারাত, যেখানে নামায আদায়ের নিয়াতে সফর করবে। অতঃপর সেখানে পৌছে তাঁর কবর যিয়ারাত করবে। আর কেউ যদি মাসজিদে নববীর যিয়ারতের সাথে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর যিয়ারাতের ইচ্ছাও করে তাও বৈধ। যে ব্যক্তি তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর হাদীছে বর্ণিত সালাত ও সালাম পড়বে তিনি ইহকালে ও পরকালের সুখ ও কল্যাণ লাভ করবেন। তাঁর সকল দুঃখ, কষ্ট ও গ্লানি দূর হবে। এ কথাগুলো হাদীছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বারা সমর্থিত "।[১০৫]

তাছাড়া শায়খ মুহাম্মাদের দাওয়াতের বিরোধীদের আরো যে সব অভিযোগ ও মিথ্যা অপবাদ রয়েছে সেগুলোর অধিকাংশই বিরোধীদের অন্যতম রিয়াদ অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট আলিম সোলায়মান ইবনু মুহাম্মাদ সুহাইমের লিখিত বক্তব্য ও চিঠি পত্রের মধ্যে রয়েছে। তিনি শায়খ মুহাম্মাদ সম্পর্কে ইরাকের বসরা এবং আহসাবাসীদেরকে সতর্ক করে এবং এর বিরোধিতার আহবান জানিয়ে এক পত্র লেখেন। তিনি সেখানে উল্লেখিত অভিযোগ সহ আরো অনেক অপবাদ শায়খ মুহাম্মাদের প্রতি আরোপ করেন, যেগুলোর অধিকাংশের জবাব তিনি তাঁর জীবদ্দশায় দিয়েছেন। অভিযোগগুলো হলোঃ

১০৫. সুলাইমান ইবনু সালমান, আল হাদিয়্যাহ আল সানিয়্যাহ ওয়াল তুহফাহ আল ওয়াহহাবিয়্যাহ আল নাজদিয়্যাহ, মিশরঃ আল মানার প্রেস, ১৩৪৪ হিঃ, পৃঃ ৪১।

তাঁর মতে-

- চার মাযহাবের সমস্ত কিতাবাদি বাতিল, ভ্রান্ত এবং তা পুড়িয়ে ফেলা প্রয়োজন।
- ছয়শত বছর থেকে মুসলিমগণ সঠিক আক্বীদাহ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।
- ইমামদের তাকলীদ করা নিষিদ্ধ।
- আলিম উলামার মতানৈক্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
- যারা নেক লোকদের উসীলা করে মুনাজাত করে তারা কাফির।
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের উপর নির্মিত গম্বুজ ভেঙ্গে ফেলতে হবে।
- কা'বা ঘরের বর্তমান মীযাব ভেঙ্গে কাঠের মীযাব নির্মাণ করতে হবে ।
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর যিয়ারতকে হারাম মনে করতে হবে।
- পিতা, মাতা ও অন্যান্য মুসলিমদের কবর যিয়ারাত করা যাবেনা।
- ইবনু ফারিয ও ইবনু আ'রাবী কাফির।
- শায়খের হাতের লাঠি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চেয়েও উত্তম।

এ সব অভিযোগ ও অপবাদের উত্তর স্বয়ং শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব দিয়েছেন।[১০৬] আবার কোন কোন অভিযোগের উত্তর তাঁর শিষ্য ও সন্তানগণও দিয়েছেন। শায়খ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব সোলায়মান ইবনু সুহাইমের উপরোক্ত অভিযোগ ও অপবাদ পত্রের উত্তরে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন। যার মূল বক্তব্য হলোঃ আমার বিরুদ্ধে উপরোক্ত অভিযোগ সহ আরো যে অপবাদ দেয়া হয় সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো আল্লাহর বাণীঃ { سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ } অর্থাৎ " আল্লাহ, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। এটা তো মস্তবড় অপবাদ"। (আন নূরঃ ১৬) তবে এ সব অভিযোগের কোন কোনটা সত্য, যা আমি বলেছি। কিন্তু এটাও সত্য যে, আমিই প্রথম বলেছি, আমার আগে কেউ বলেননি, এমন নয়। বরং এ বিষয়গুলো হাম্বলী মাযহাবের কিতাবাদি এবং অন্যান্য মাযহাব ও আলিমদের বই পুস্তকগুলোতেও উল্লেখিত আছে। আমি আরো বলতে চাই যে, আলিম ও বিদ্বান ব্যক্তিগণ যদি কোন মাসআলার ব্যাপারে মতানৈক্য করেন তাহলে তার সমাধানের জন্য তাদের কি করা উচিৎ । সেক্ষেত্রে তাদের জন্য আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আহলুল ইলম এর পথ অনুসরণ করা অপরিহার্য নাকি প্রচলিত সমাজব্যবস্থার অনুসরণ করা অপরিহার্য, যদিও সে সমাজব্যবস্থা আলিমগণের লিখিত কিতাবাদির বক্তব্যের পরিপন্থী হয়? তাই আমি যা বলি তা স্পষ্ট, কুরআন, সুন্নাহ এবং আলিমদের

১০৬. ইবনু আবদিল ওয়াহহাব, আল রাসায়েল আল শাখসিয়্যাহ, আল কিসমুল খামিছ, পৃঃ ১৪৫ – ১৪৭ (বুহুছ নাদওয়াতে দাওয়াতিশ শায়খ, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃঃ ৮১ – ৮৪, ২৭৪।

কথার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল ও সঙ্গতিপূর্ণ। তবে হতে পারে তা সমাজব্যবস্থা বা প্রচলিত সমাজের মানুষের আদত অভ্যাসের বিপরীত। তাই তারা বিরোধিতা করে। কেননা তারা এভাবেই গড়ে উঠেছে। অথচ সত্য তাদের সামনে স্পষ্ট। নিজেদের চোখে তারা বিভিন্ন কিতাবাদিতে দেখে থাকে, পড়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবে তাদের অবস্থা হলো যেমন আল্লাহ্ তাআ'লা ইরশাদ করেনঃ

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ

অর্থাৎ "যখন সত্য তাদের সামনে সমাগত হলো, তখন তারা তা চিনলো না, জানলো না। সত্যকে অস্বীকার করে বসলো। অতঃপর কাফিরদের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত ধার্য হয়ে পড়লো'। (আল বাকারাহঃ ৮৯)

তিনি আরো বলেনঃ

" فما ذكره المشركون أنّي أنهى عن الصلاة على النبي أو أنّي أقول لو أنّ لي أمرًا هدمتُ قُبّةَ النبي، أو أنّي أتكلّمُ في الصالحين، أو أنهَى عن محبّتهم فكلّ هذا كذبٌ وبهتانٌ افتراه عليّ الشياطين ".

অর্থাৎ "মুশরিকদের অভিযোগ, আমি নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর সালাত পাঠ করতে নিষেধ করি, অথবা আমি বলি যে, যদি আমার শক্তি থাকতো তাহলে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরের উপরের গম্বুজ ভেঙ্গে ফেলতাম, কিংবা আমি নেক বান্দাদের সমালোচনা করি বা তাদেরকে মুহাব্বত করতে নিষেধ করি' এ সব কিছুই মিথ্যা ও অপবাদ যা শয়তানেরা আমার উপর আরোপ করেছে"।[১০৭]

তিনি আরো বলেনঃ

"كذلك قولهم أنّي أقول من تبع دين الله ورسوله وساكنٌ في بلده أنّه ما يكفيه حتى يجيء عندي، فهذا أيضاً من البهتان ".

অর্থাৎ "অভিযোগকারীরা আরো বলে 'আমি নাকি বলেছি যে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দীনের অনুসরণ করে যার যার দেশেই অবস্থান করে, আমার নিকট আসে না, তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে না। এটাও আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ"।[১০৮]

এভাবে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব তাঁর জীবদ্দশায়ও তাঁর প্রতি আরোপিত অভিযোগ ও অপবাদগুলোর জবাব পত্রাবলী ও লেখনীর মাধ্যমে দিয়েছেন।

১০৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২, (বুহুছ নাদওয়াতে দাওয়াতিশ শায়খ, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৮৩)।
১০৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৮৩।

তাছাড়া তাঁর ছাত্র, শিষ্য ও অনুসারীগণও এ সব অভিযোগের যথাযথ উত্তর দানের মাধ্যমে এগুলোর অসারতা প্রমাণ করেছেন। প্রকৃত সত্য অনুসন্ধানী পাঠক ও গবেষকগণ নিরপেক্ষ মন নিয়ে সে লেখাগুলো অধ্যয়ন করলে সত্য জানতে পারবেন। বস্তুতঃ শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব এবং তাঁর অসংখ্য ছাত্র ও অনুসারীদের লেখা পুস্তকাদি ও গ্রন্থাবলী সহজলভ্য। সেগুলো পাঠ করলে প্রমাণিত হবে যে সবগুলো অভিযোগই মিথ্যা। এতে সত্যের লেশ মাত্র নেই। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই এই সত্য দাওয়াত থেকে মানুষদেরকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যেই এ জঘন্য মিথ্যাচার করা হয়েছে। এবং এখান থেকেই ওয়াহহাবী নামের উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান ও ওয়াহহাবী আন্দোলনকে ৫ম মাযহাব নামে ব্যাপক প্রচারের মূল রহস্য সহজেই অনুধাবন করা যায়।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের সংস্কার আন্দোলন ও প্রাচ্যবিদগণঃ

পশ্চিমা জগতের কিছু অমুসলিম ব্যক্তি, যারা পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোর ভূখন্ড, জলবায়ু, মাটি, পাহাড় পর্বত, আবহাওয়া, পবিবেশ, মানুষ, তাদের ভাষা, বর্ণ, ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, জীবনাচার ও ইতিহাস ঐতিহ্য জানার জন্যে সে দেশগুলোতে এসে অধ্যয়ন ও গবেষণা কর্মে রত থাকেন, তাদেরকে প্রাচ্যবিদ বলা হয়। বাহ্যতঃ এই উদ্দেশ্য নিতান্ত ই জানা, শিক্ষা ও একাডেমিক হলেও তারা মূলতঃ পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোর মধ্যে মুসলিম দেশগুলোকেই বেছে নিয়ে সে দেশগুলোর অধিকাংশ বাসিন্দা 'ইসলাম' ধর্মের অনুসারীদের আকীদাহ বিশ্বাস ও জীবন পদ্ধতি নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকেন। এ লক্ষ্যে মুসলিম জাতির জীবনাদর্শ ইসলামকে নিয়ে ব্যাপক লেখা পড়া করেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে বিষয়টি সংশয়পূর্ণ না হলেও তাদের অধিকাংশের কর্মকান্ডে সংশয় সৃষ্টি হয় বা হয়েছে যে, তাদের এই ব্যাপক ও গভীর পড়ালেখার লক্ষ্য হলো ইসলাম ও মুসলিম জাতির ত্রুটি ও কমতিগুলো গবেষণার নামে অনুসন্ধান করা এবং খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সেগুলোকে সংশয়পূর্ণভাবে প্রকাশ করা যাতে করে অমুসলিম জাতি ইসলামকে ভিন্ন চোখে বিচার করে মানবতার মুক্তির একমাত্র পথ ইসলামী জীবনাদর্শ ও ব্যবস্থা থেকে দূরে অবস্থান করে। অপরদিকে মুসলিম জাতি, বিশেষ করে তাদের আধুনিক শিক্ষিত সমাজ পাশ্চাত্যের এ সকল শিক্ষার্থীদের গবেষণাধর্মী লেখা বই পুস্তক পাঠ করে নিজেদের জীবনাদর্শ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠে। এই বাস্তব অবস্থাই আজ সর্বত্র দৃশ্যমান। যদিও তাদের মধ্যে অনেকে এমন আছেন যারা প্রকৃত অর্থেই গবেষণার মাধ্যমে ইনসাফ ও নিষ্ঠার সাথে একাডেমিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই কাজ করেছেন। এবং শিক্ষার জগতে অনেক বড় অবদান রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে জর্জ বার্নাডশ, জিগরিদ হুংকা এবং টমাস আরনল্ড রয়েছেন।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কেও প্রাচ্যবিদগণ অনেক লেখালেখি, বিচার বিশ্লেষণ ও মন্তব্য করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

তারা তাদের অসৎ উদ্দেশ্য ও হীনমন্যতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। তাদের লেখাগুলোর মধ্যে সন্দেহ সংশয়, তথ্য বিকৃতি, সত্যকে পাশ কাটানো, কল্পনা নির্ভর তত্ব ও তথ্য রয়েছে যা এই আন্দোলন সম্পর্কে মানুষদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। নির্ভেজাল তাওহীদ নির্ভর এই সত্য আন্দোলনের বিরুদ্ধে যত অপপ্রচার, কল্পনাপ্রসূত অভিযোগ ও মিথ্যা অপবাদ ছড়ানো হয়েছে, তার অধিকাংশই প্রাচ্যবিদদের লেখার উপর নির্ভর করেই করা হয়েছে। মুসলিম সমাজের মধ্যেও স্বার্থান্বেষী বিরোধী মহলের সমন্বয়ে তারা এই লেখাগুলোকে সমৃদ্ধ করেছে। নিম্নে তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলোঃ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরের উপর নির্মিত গম্বুজ ভেঙ্গে ফেলার অপবাদ। এ বিষয়টিকে প্রাচ্যবিদ ঐতিহাসিকগণ ব্যাপকভাবে প্রচার করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন লোথরোপ স্টুডার্ড, (The New World of Islam:1/64), টোমাস হিউজিস (Dictionary of Islam: 660), যুয়াইমার (Arabia, The Cradle of Islam:195), ওয়েলফিড স্কাউন বালিন্ট (Future of Islam: 45) এবং মারগালিউথ (Encyclopedia of Relegions and Characters: 2/661)।[১০৯]

প্রাচ্যবিদগণ শায়খের দাওয়াত ও তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে অনেক ভুল ও মিথ্যা তথ্য তাদের লেখাগুলোর মাধ্যমে দেবার চেষ্টা করেছেন এবং এই সত্য দাওয়াত সম্পর্কে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করেছেন। এ ক্ষেত্রে তারা পরস্পর পরস্পরের লেখার উপর নির্ভর করেছেন। গবেষক হিসাবে সত্য অনুসন্ধানের জন্য নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে প্রকৃত বিষয়কে পাঠকের নিকট তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যদের মতো ভূমিকা পালন করলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তারা সত্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যেমন মিষ্টার ব্রাইজেস। তিনি শায়খের দাওয়াত এবং তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে আরোপিত কতিপয় অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন যে, সাউদ ইবনু আবদিল আযীযের প্রতি অভিযোগ করা হয় যে, তিনি মানুষদেরকে মদীনা যিয়ারত করতে নিষেধ করেছেন। এটা মোটেও সত্য নয়। বস্তুতঃ তিনি রওযা মুবারকের নিকট অনুষ্ঠিত শিরকী কার্যকলাপগুলোকেই নিষেধ করেছেন। একইভাবে তিনি নেক লোকদের কবরের নিকটও এরূপ কর্মকান্ড করতে নিষেধ করেছেন।

তিনি আরো বলেন কতিপয় মূর্খ লোক মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব ও তার অনুসারীদেরকে কাফির মনে করে। তুর্কী শাসকরাও এ ধরণের অপপ্রচারের উপর নির্ভর করেছেন। অথচ প্রকৃত বিষয় হলো যে, তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর সত্যিকারের অনুসারী। তাঁদের আন্দোলন হলো ইসলামকে যাবতীয় পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র ও নির্ভেজাল করার আন্দোলন।[১১০]

১০৯. মাসউদ নদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৩।
১১০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৪।

দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের প্রসারের কারণসমূহঃ

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের বিরোধিতা, অপবাদ, অপপ্রচার ইত্যাদি সত্বেও এই আন্দোলন মুসলিম বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই ছড়িয়ে পড়ে। সঠিক ইসলামী দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলন যেখানেই শুরু হয়েছে সেখানেই এর প্রভাব এবং আছর পরিদৃশ্যমান। কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী মহল ব্যতিত সত্যপন্থী ও সকল সুস্থ জ্ঞানবান মুসলিম জনগোষ্ঠীর নিকট এই দাওয়াত ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। তাই এই আন্দোলনের সফলতার পেছনে যে সকল উল্লেখযোগ্য কারণ রয়েছে তার কিছু কিছু আমরা এখানে উল্লেখ করাকে প্রাসঙ্গিক মনে করি।

এক. দাওয়াতের স্বাভাবিক নীতিমালাঃ এই দাওয়াত ও আন্দোলনের নীতিমালা একাধারে অতি স্পষ্ট এবং স্বভাব সম্মত। এখানে কোন প্রকার জটিলতা, দার্শনিক ও তাত্বিক অস্পষ্টতা এবং অতিন্দ্রিয়তার রহস্যের বালাই নেই। শিরক ও বিদ'আতের সকল পঙ্কিলতা বিমুক্ত, পূত পবিত্র ও নির্ভেজাল ইসলামের দিকে মানুষকে দাওয়াত প্রদান করা হয়েছে।

দুই. দাওয়াতদানকারী ব্যক্তির শক্তিশালী ঈমানী দৃঢ়তা ও চারিত্রিক মাধুর্যঃ এই দাওয়াতের ধারক শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব তাঁর সমস্ত শক্তি, উদ্যম ও কর্মস্পৃহাকে আল্লাহর পথের দিকে দাওয়াত দানের কাজে ব্যয় করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কোন প্রকার কার্পণ্য করেননি। প্রচন্ড ঈমানী শক্তি ও প্রবল মানসিক আকাঙ্খা ও সুদৃঢ় চিত্ত সহকারে নিরলসভাবে এই দাওয়াতকে তিনি এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এবং দাওয়াতের অনুসারীদেরকে মজবুত ও বলিষ্ঠ সাংগঠনিক ভিত্তির উপর একত্রিত করেছেন। তিনি মনে করেন যে, গোটা ইসলামী দুনিয়া দীন ইসলামের সঠিক ভিত্তি থেকে সরে গেছে। সৎ সংস্কারকগণ যদি দাওয়াত ও আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে পরিশুদ্ধ করার কাজে উদ্যোগী না হন তাহলে মুসলিম সমাজ ধ্বংসের দিকেই এগিয়ে যাবে। তাই তিনি তাঁর দাওয়াতকে কথা, কাজ, লেখনী এবং এ কাজে তাঁর সহায়ক ও সহযোগীদের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দাওয়াতকে এগিয়ে নিয়েছেন। তিনি বহুবিধ চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করেই সত্যিকারের ইসলামী দাওয়াতকে সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌছে দিয়েছেন।

তিন. দাওয়াতের জন্য ব্যবহৃত রাজনৈতিক শক্তিঃ শায়খ মুহাম্মাদের দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলন রাজনৈতিক শক্তির সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করে। মূলতঃ শায়খ মুহাম্মাদ ও দারঈয়্যার শাসক মুহাম্মাদ ইবনু সউদের মধ্যে অনুষ্ঠিত চুক্তির (১১৫৭হিঃ/ ১৭৪৪ ঈ.) ভিত্তিতেই এই দাওয়াত রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করে, যার ফলে এই দাওয়াতের আওয়াজ, নীতিমালা পূর্ব ও পশ্চিম সকল এলাকাতেই পৌছে যায়। তাই এ কথা বলা যায় যে, আল্লাহর তাওফীক, অতঃপর এই রাজনৈতিক ও সরকারী সমর্থন ও সহোযোগিতা না পেলে হয়তো শায়খ মুহাম্মাদ তাঁর দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলন

নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন না। সুতরাং শায়খ মুহাম্মাদের দাওয়াতী কার্যক্রম নিছক ধর্মীয় নয় বরং দীনী ও রাজনৈতিক কার্যক্রমের এক চমৎকার সমন্বিত প্রয়াস। এই দাওয়াতের সরাসরি অনুসারী সউদ বংশের শাসকগণ নিজেদের জীবন, ধন সম্পদ ও রাজনৈতিক শক্তিকে এই পথে ব্যয় করেছেন, যার বর্ণনা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।

চার. দাওয়াতের ক্ষেত্রঃ নজদ এলাকায় শায়খ মুহাম্মাদের দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু হয়। এ এলাকাটি মরু অঞ্চল হওয়ায় দাওয়াতী কাজের জন্যে উপযোগী। কারণ মরু এলাকার মানুষগুলো একদিকে সহজ সরল জীবন যাপন করে থাকে, অপরদিকে তাদের মধ্যে রয়েছে সাহসিকতা, মানবতাবোধ, উদার মানসিকতা ও ধৈর্য শক্তি। দায়িত্বের কঠিন বোঝা বহন করার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষও তাদের মধ্যে রয়েছেন। তাই যে কোন ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করেন। তাছাড়া এ অঞ্চলটি উছমানী শাসন, এবং শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, তথাকথিত সূফী সাধক এবং বিভিন্ন মাযহাবের ফক্বীহগণের প্রভাব থেকে দূরে ছিল। তাই তাওহীদী আন্দোলন প্রচারের জন্য এ অঞ্চল ও সমাজ অনুকূল ও উপযোগী হওয়ায় শায়খ মুহাম্মাদের নেতৃত্বে এ আন্দোলন সফলতা পায়। অন্যদিকে একই আন্দোলন ও দাওয়াত হওয়া সত্বেও শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (৬৬১ – ৭২৮হিঃ) সিরিয়াতে ততটা সফলতা অর্জন করতে পারেননি।[১১১]

পাঁচ. দাওয়াত ও আন্দোলনে আলিমগণের ভূমিকাঃ বলা যায় যে, শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলন ইসলামী বিশ্বে প্রচার ও প্রসারের মূল ভিত্তি ছিলেন এই আন্দোলনের অনুসারী আলিম ব্যক্তিবর্গ। মূলতঃ এ সকল আলিম বিভিন্ন দেশে সফর করে এই দাওয়াতকে ছড়িয়ে দেন। অন্যদিকে তাঁদের লেখা পুস্তাকাদি এবং দাওয়াতী পত্রাবলীও এ দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে অনেক বড় অবদান রাখে। অধিকন্তু এই আন্দোলনের সহায়ক শক্তি সউদ পরিবারের শাসকগণও তাওহীদের এই দাওয়াতকে মুসলিম বিশ্বে পৌছানোর জন্য সরকারীভাবে একদল মুবাল্লিগ নিযুক্ত করে। তাঁরা আরব উপসাগর সহ বিভিন্ন মুসলিম এলাকাগুলোতে তাওহীদের এই দাওয়াত প্রসারের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেন। ফলে নির্ভেজাল এ তাওহীদী আন্দোলন স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

ছয়. সময়ের দাবিঃ সময়ের ব্যবধানে মানুষের সমাজ যখন অধপতনের দ্বার প্রান্তে পৌছে যায় তখন ঐ সময়, কাল ও সমাজের প্রয়োজন হয় (Neccesity of the Society) একটি সংস্কার আন্দোলনের। শায়খ মুহাম্মাদের সময় মুসলিম সমাজের সঠিক আকীদাহ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যে অধপতন ঘটে ছিল তাতে সেই সমাজ ও সময় যেন এ রকম একটি বৈপ্লবিক সংস্কার আন্দোলনের অপেক্ষা করছিল। মুসলিম সমাজ

---

১১১. মুহাম্মাদ ইবনু আল সালমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫।

একদিকে শিরক, বিদ'আত, নৈতিক অধপতন এবং অপসংস্কৃতির সয়লাবে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল, অপরদিকে অভাব অনটন, সামাজিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক সংকট এবং রাজনৈতিক দুর্বলতা ও বিপর্যয়ের দরুন ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছিল। এমনি একটি উপযুক্ত সময়েই শায়খ মুহাম্মাদের নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী দাওয়াত ও তাওহীদী আন্দোলনের সূচনা হয়। যা মানুষ ও সমাজের জন্য একমাত্র রক্ষা কবচ হিসাবে আবির্ভূত হয়। মানুষ প্রকৃতি ও স্বভাব সম্মত পথের দিশা পায়। ইসলামের প্রাথমিক যুগের আদলে ইসলামী নীতিমালা ও কার্যক্রম সমাজে চালু হয়। মানুষের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, দীন ইসলামের সঠিক নীতি, আদর্শ ও ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে মুসলিম বিশ্বের হারানো গৌরব ও ঐতিহ্য নতুন করে তাদের মধ্যে ফিরে আসতে পারে।

সাত. হজ্বের স্থান ও মৌসুমঃ শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলন মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র দ্রুত প্রসার ও প্রচার পাওয়ার একটি কারণ হলো হজ্বের স্থান ও মৌসুম। কেননা ত্রয়োদশ শতাব্দির দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে (১২১৭-১২২৬ হিঃ) প্রথম সউদী রাষ্ট্রের নেতৃত্বে সমগ্র ইসলামী জগত থেকে হাজীগণ হিজায তথা মক্কা ও মদীনায় হাজ্বের উদ্দেশ্যে আগমনের ফলে শায়খ মুহাম্মাদের এ দাওয়াত ও এর প্রকৃতি সম্পর্কে জানার সুযোগ পায়। তাছাড়া এই দাওয়াতের অনুসারী আলিম উলামা ও দা'য়ীগণের সাথে তাঁদের দেখা সাক্ষাৎ এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দাওয়াতের ব্যাপারে পরিতৃপ্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। বিশেষ করে ইসলামী জীবন বিধান কার্যকর করার কারণে হিজায সহ সউদী রাষ্ট্রের সর্বত্র শান্তি, নিরাপত্তা ও সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত দেখে হাজীগণ দ্রুত এ দাওয়াত গ্রহণ করেন এবং নিজেদের দেশে ফিরে গিয়ে দাওয়াতের এ সওগাত পৌঁছে দেন। মানুষদের নিকট সত্যের দাওয়াত দিতে থাকেন। আন্দোলনের কর্মী ও দাওয়াতদানকারীদের লক্ষ্য ছিল যে, তাঁরা যে দেশেই গিয়েছেন সেখান থেকে ফিৎনা ফাসাদ, শিরক, বিদ'আত, ইসলাম পরিপন্থী সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্তন করতে চেষ্টা করেছেন। মুসলিম সমাজ থেকে আকীদাহ বিশ্বাসের ভ্রান্ত ধারণার বিলোপ করে তাদের মধ্যে ইসলামের সঠিক আকীদাহ বিশ্বাস ও নির্ভেজাল তাওহীদের বীজ বপন করেছেন। এবং ইসলামকে দীন ও জীবন বিধান হিসাবে কার্যকর করার প্রত্যয় নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন।

আট. ইসলামী বাণিজ্য সম্পর্কঃ মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ইসলামী বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠা ও সুদৃঢ় হওয়ার ফলে এই দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলন মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কোন কোন ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক এ সম্পর্ক ব্যক্তিগত পর্যায়েও হয়েছে। আবার রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও হয়েছে। তৎকালীন সউদী সরকার বিভিন্ন মুসলিম দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করেছে। তাই যে সব স্থানে সউদী রাষ্ট্রের নেতৃত্বে অন্যভাবে এ দাওয়াত পৌছানো যায়নি সেখানে

(যেমন ইন্দোনেশিয়া, মধ্য আফ্রিকা এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপ অঞ্চলের দেশগুলোতে) বাণিজ্য সম্পর্কের মাধ্যমে এ দাওয়াত ও আন্দোলনের প্রসার ঘটেছে।

নয়. দাওয়াতের বিরোধীদের ভূমিকাঃ শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের খাঁটি তাওহীদবাদী সংস্কার আন্দোলনের পরিচিতি বিরোধীদের মাধ্যমেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। কারণ তাঁরা এ দাওয়াত থেকে মানুষদেরকে সতর্ক করার জন্য নিজেরাই দাওয়াত প্রচার করতে থাকে। ফলে স্বভাবগতভাবে এ দাওয়াত ও আন্দোলন এবং এর কর্মসূচী জানার জন্যে মানুষের মধ্যে এক অদম্য আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তারা জানার আগ্রহ নিয়ে নিজেরাই অনুসন্ধান করে হকের দাওয়াত সম্পর্কে অবগত হয় এবং তা গ্রহণ করে। শায়খ হুসাইন ইবনু গান্নাম এর সপক্ষে আব্বাসী যুগের একজন বিখ্যাত কবি আবু তাম্মামের একটি উদ্বৃতি দেন যে তিনি বলেনঃ "আল্লাহ তায়া'লা যখন কোন ভাল বিষয়কে জন সমক্ষে প্রচার করতে চান তখন এর বিরোধীদের জবান দ্বারাই তা করিয়ে থাকেন। আর সুগন্ধি কাঠের সুঘ্রান পেতে হলে তা আগুন দিয়েই পোড়াতে হয়"।[১১২] তাই বিরোধীদের অপপ্রচার যত বেশি এ আন্দোলন সম্পর্কে হয়েছে ততবেশি এ আন্দোলন প্রচার পেয়েছে এবং জনসমর্থিত হয়েছে।

উপসংহারঃ

মূলতঃ শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাবের চিন্তাধারা, দাওয়াত ও সংস্কার কর্ম মুসলিম দেশ ও জাতির এক ক্রান্তি লগ্নেই শুরু হয়। মুসলিম জাতি একদিকে ধর্মীয় আকীদাহ বিশ্বাস, রীতিনীতি, আদর্শ ও সংস্কৃতির দিক থেকে চরম অধপতনে পতিত হয়। তাদের নৈতিক চরিত্র, আচার আচরণ, কৃষ্টি কালচার সব কিছুই ইসলামের নীতিমালার পরিপন্থী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শিরক বিদ'আত ও কুসংস্কার দিয়ে প্রায় গোটা মুসলিম সমাজ ছেয়ে যায়। অপরদিকে ধর্মীয়, আকীদাহগত এবং সাংস্কৃতির বিপর্যয়ের ফলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ও তাদেরকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে যায়। এমনি সময় দ্বাদশ হিজরী শতাব্দিতে শায়খ মুহাম্মাদের সঠিক দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলন আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবতার জন্য একটি মস্তবড় নিয়ামত। তিনি নিষ্ঠার সাথে প্রথমেই নিজের এলাকাতে কাজ শুরু করেন এবং পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলনকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পূর্ণ সফলতা দান করেন। এই দাওয়াতের উপর ভিত্তি করে সউদী আরব একটি ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এই দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলন আরব এলাকার বাইরেও মুসলিম দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। এর প্রভাব সমস্ত মুসলিম দুনিয়ার দেশগুলোর ইসলামী আন্দোলনের উপর ব্যাপকভাবেই পড়ে। অল্প দিনের মধ্যেই এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এই দাওয়াত ও আন্দোলন সরাসরি বা এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েই চলতে থাকে। এই দাওয়াতের প্রভাব সত্যপন্থী আলিম, উলামা, মাশায়েখ ও দায়ী'দের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। সত্য দীন ও তাওহীদের সঠিক জ্ঞান ও বাস্তবায়ন তাদের

---

১১২. ইবনু গান্নাম, রওযাতুল আফকার, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৪।

মধ্যে এক নতুন জীবন দান করে এবং তারা স্ব স্ব দেশে এই সত্য দাওয়াতের ঝান্ডা সমুন্নত করেন। শুধু তাই নয় জ্ঞানী ও ইসলামী চিন্তাবিদদের মন মগজ ও চিন্তার জগতেও শায়খের দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলন ব্যাপক প্রভাব ফেলে। কারণ ইসলামের সঠিক ও স্বচ্ছ নীতিমালার সঙ্গে শায়খের চিন্তা ও কর্মের সামঞ্জস্য রয়েছে। তাই যে কোন বিবেকবান ও সত্যসন্ধানী, চিন্তাশীল মানুষের মনে তা নাড়া না দিয়ে পারেনা।

শায়খ মুহাম্মাদের দাওয়াত ছিল হকের দাওয়াত। যা অন্ধকার যুগে আলোক বর্তিকা হিসাবে কাজ করে। এ দাওয়াত সকল বাধা বিপত্তিকে জয় করে সফলতার দিকে এগিয়ে যায়। নিজ দেশে তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং তাওহীদ ভিত্তিক একটি ইসলামী রাষ্ট্রও গঠিত হয়। একইভাবে এ আন্দোলন দেশে দেশে ইসলামী আন্দোলনের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। যেমনঃ লিবিয়াতে সানুসী আন্দোলন, পশ্চিম আফ্রিকাতে উছমান দানফুদিওর আন্দোলন এবং পাক ভারত উপমহাদেশে সাইয়েদ আহমাদ বেরেলভীর আন্দোলন। মুসলিম বিশ্বে এ আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হলো যে, তখনকার মুসলিম বিশ্ব ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিকে থেকে চরম অধপতন ও বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত ছিল। তাই এ আন্দোলন ও দাওয়াত তাদের মধ্যে নতুন প্রাণের সৃঞ্চার করে। তখনকার মুসলিম বিশ্বের উল্লেখযোগ্য দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনের কর্মসূচীর দিকে নজর দিলে প্রতীয়মান হয় যে, এ সকল আন্দোলনের মূল কর্মসূচী শায়খ মুহাম্মাদের দাওয়াত ও আন্দোলনের সাথে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যশীল ছিল। সকল আন্দোলন খাঁটি তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দান, ইজতিহাদের দরোজা উন্মুক্ত করার আহবান এবং কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক ও যথাযথ অনুকরণের মাধ্যমে অন্ধ অনুসরণ ও অন্ধ তাকলীদ বর্জন করাকে প্রাধান্য দিয়েছে।

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান করুণ অবস্থার প্রেক্ষিতে যদি সত্যিকারের অর্থে সকল দুর্বলতার উর্ধে উঠে খাঁটি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও উপরোক্ত মৌলিক কর্মসূচী সহ সত্যিকারের ইসলামী সংস্কার আন্দোলন নিষ্ঠার সাথে পুনর্জীবিত করা যায় তাহলে মুসলিমগণ তাদের হারানো সম্মান, প্রভাব প্রতিপত্তি, নেতৃত্ব এবং তাহযীব - তামাদ্দুন পুনরুদ্ধারে সফল হবে। নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই একটি সমাজে ও রাষ্ট্রে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের পথ সুগম হবে। আর তখনই মুসলিম উম্মাহ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করতে সক্ষম হবে। আল্লাহ তায়া'লা মুসলিম জাতিকে এ বিষয়টি বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

--o--

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা